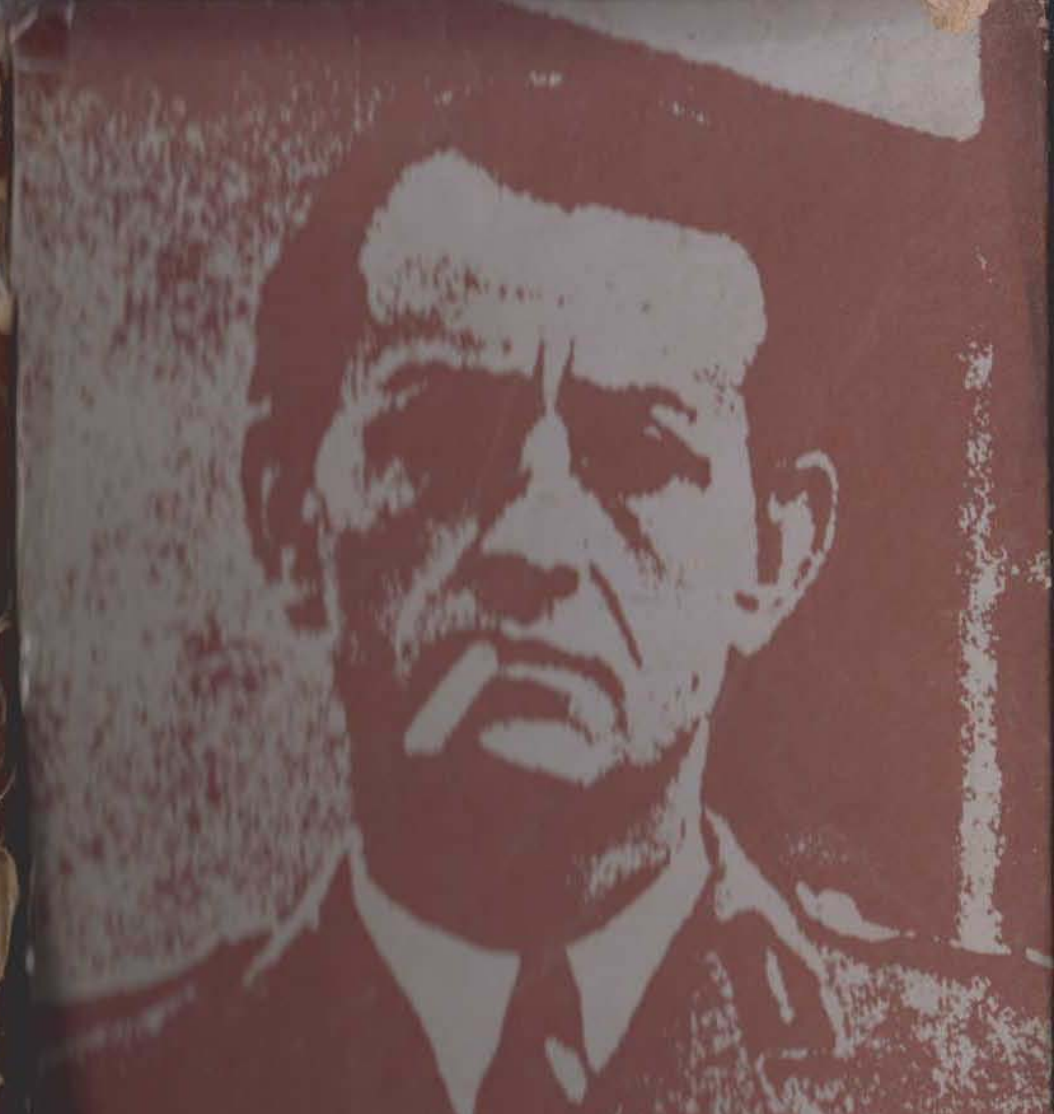

আঁদ্রে মালরো

শতাব্দীর কিংবদন্তী

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

অঁদ্রে মাল্‌রো ঃ শতাব্দীর কিংবদন্তী

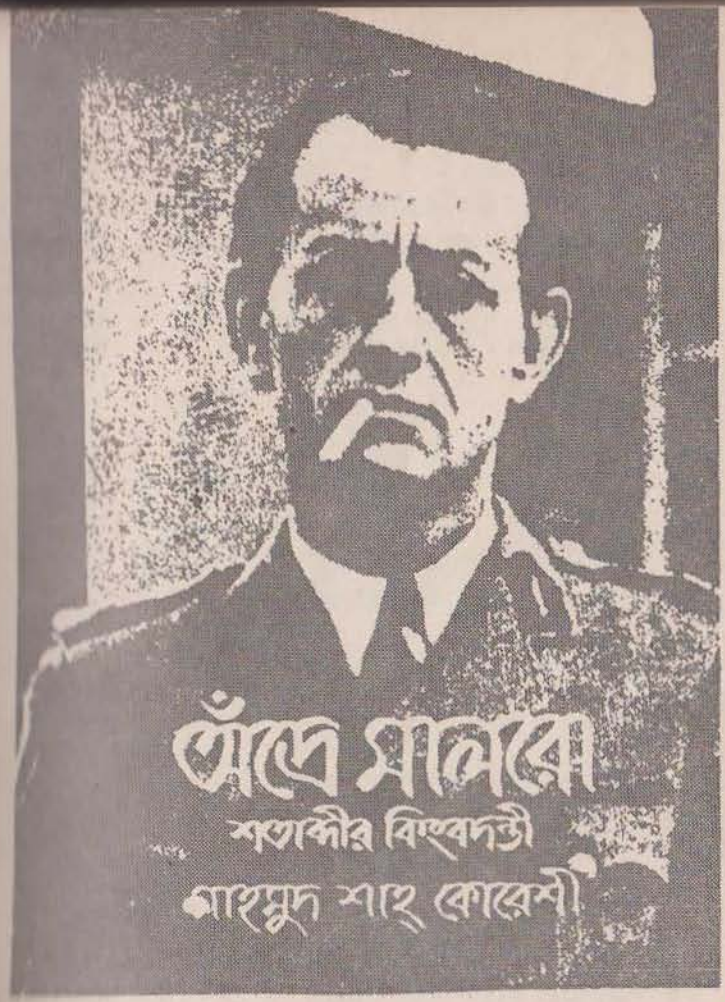

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা

অঁদ্রে মাল্‌রোর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ফরাশি দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ্‌ দ্য ঢাকা-র যৌথ প্রকাশনা

Pour commémorer le 10e Anniversaire de la Mort d' André Malraux
Publié conjointement par le Service Culturel de l' Ambassade de France a Dhaka et l' Alliance Francaise de Dhaka, Bangladesh

প্রথম প্রকাশ : ৭ই পৌষ ১৩৯৩ / ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা
পরিবেশক : ধানশীষ প্রকাশনী ৫ আইউব আলী কলোনী
নিউমার্কেট, ঢাকা — ৫
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র ।। বিদেশে তিন ডলার/বিশ ফরাশি ফ্রঁ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

André Malraux : Shotabdir Kimbonti
[A.M. : La Légende du Siecle] par Mahmud Shah Qureshi
Premiere édition : le 23 décembre, 1986
Couverture : Qayyum Chowdhury
Imprimeur : Obaidul Islam
Directeur adjoint chargé de l' Imprimerie de L' Académie Bengalie
Prix : Taka 50.00 U.S. dollar 3, Fr. Fr. 20.00.
Copyright reserved by the author

On ne possede que ce qu'on aime.
La Voie royale

'তাতেই তো শুধু অধিকার যা একান্ত ভালোবাসার'
রাজকীয় সড়ক : অঁদ্রে মাল্‌রো।

মৃত্যু কি অস্তিত্বের সংশোধন মাত্র ?
মৃত্যু কি ছিনিয়ে নেয় বন্ধুত্ব অপার ?

সদ্যপ্রয়াত শিল্পী রশীদ চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশে

—কোরেশী
১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

সূচীপত্র

৯ ভূমিকার বদলে : আগুনের মতো ॥ মার্ক শাগাল

১১ শতাব্দীর কিংবদন্তী

১৪ 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা'

১৯ যৌবন-জল-তরঙ্গ

২৪ বাঁচার মতো বাঁচা

৪৮ 'সব পাখি ঘরে আসে. . .'

৬৯ উপসংহারের পরিবর্তে : গভীর চৈতন্যের মানুষ ॥ লেওপোল্দ সেদার্ সঁঘর্

৮২ পরিশিষ্ট : বাংলাদেশে মাল্‌রো

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ॥

Etude sur l'évolution chez les Musulmans du Bengale : 1857—1947 Paris—La Haye : Mouton & Co. : 1971

Parallele : Poemes bengalis-francais :
Chittagong : Alliance Francaise, 1976

Poemes mystiques bengalis : chants bauls
(Unesco) Paris : Editions St. Germain-des-Pres, 1977

Diderot / দার্শনিক দিদ্রো ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি
Dhaka : Alliance Francaise, 1984

চাঁদের অপেরা : জাক প্রেভের-এর 'লপেরাদ্ লা লুন'-এর অনুবাদ।
ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী : ১৯৮৫

Tribal Cultures in Bangladesh (edited : 1985)
Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University.

সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ / Festschrift for Syed Ali Ahsan
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহযোগে সম্পাদনা : ১৯৮৫

আগুনের মতো

মার্ক শাগাল

মাল্রো এখন আমাদের মধ্যে নেই এবং তাঁর সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে লিখছি একথা ভাবতেই পারি না। শব্দও খুঁজে পাই না, বুঝতেও পারি না। তাঁর মৃত্যুতে আমি এতই মুষড়ে পড়েছিলাম যে মুখ দিয়ে কোনো কথা সরেনি। যে শূন্যতা ও দুঃখের জন্ম হলো তা' প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

এই কিছুকাল আগে তিনি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে গিয়েছি বাইরে। দীর্ঘ সময় কথা বলছিলেন তিনি। তাঁর সপ্রতিভ আলোচনা আমাকে শিল্পের সেই জগতে নিয়ে গিয়েছিল যার সম্পর্কে তাঁর মতো জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ঠিকই বুঝতে পারছিলেন আমার মনের কথা। আমি চুপচাপ থাকলাম। তার কথা শুনছিলাম এবং প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ থেকে উৎসারিত প্রতিটি শব্দ ধরে রাখছিলাম।

তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করছিলাম এবং লক্ষ্য করছিলাম তাঁর অভিব্যক্তি : একটু যেন শংকার ভাব। তিনিও আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলেন। কী দেখছিলেন তিনি?

তাঁর চেহারায় অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল কিছু চেনা মুখের। রোমক ক্যাথিড্রালের পুরনো ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা সেই মুখ। অচেনা প্রতিভাধর ভাস্করের হাতে মর্মরে খোদিত প্রেরিত পুরুষদের মতো চোখ নিয়ে উপস্থিত এই মুখ। মাল্রোর অভিব্যক্তিতে যে প্রার্থনা এবং দুর্ভাবনার ইঙ্গিত তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে এই সব ভাস্কর্যের। আমি গভীরভাবে আন্দোলিত হচ্ছিলাম।

এখন তিনি নেই। আমাদের সবার জন্যে এ-এক গভীর শূন্যতা কিন্তু রইল তো তাঁর সাহিত্যকর্ম।

আপনার কি মনে পড়ে মার্সেল আরলঁ, ১৯২২ সালে সোভিয়েৎ রাশিয়া থেকে চলে এসে গাল্‌রী বার্বাযঁগ্-এ অনুষ্ঠিত আমার প্রথম প্রদর্শনীর কথা? জঁ পোলাঁ, মাল্‌রোসহ একদল তরুণ লেখক নিয়ে আপনি এসেছিলেন। সবাই

আমার ছবির ওপর চোখ বুলিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন নানা মন্তব্য। একা মাল্‌রো শুধু দেখছিলেন, নিবিষ্ট নীরবতায়।

পরে তিনি প্রায়ই আসতেন আমার বাড়ীতে। মস্কোর জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। জবাবের অপেক্ষা না করেই হয়তো একই নীরবতা নিয়ে চলে যেতেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রী হবার পর তিনি আমাকে ডাকলেন তাঁর বাড়ীতে। অপেরা ভবনের ছাদ অলংকরণের কথা বললেন। আমার খুব ভালো লাগল যে অল্প কথায় করেছিলেন এই প্রস্তাব।

আমার মনে হয়, তিনি ছিলেন আমার সবচে' বড় বন্ধু। তাই গভীর আবেগ নিয়ে আমি তাঁর 'অঁতিমেমোয়ার' (স্মৃতিকথা) বইটি চিত্রশোভিত করেছি। স্পেনের যুদ্ধের ওপর লেখা উপন্যাসটিতেও একই আবেগে ছবি এঁকেছি। এ বিষয়ে তিনি আমাকে লিখেছিলেন এক দীর্ঘ পত্র। আজ এই ভেবে নিজেকে খুবই সুখী মনে করি যে আমার এই কাজটি তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন।

কিন্তু মাল্‌রো আমার বন্ধুরও বাড়া।

তিনি ছিলেন ফ্রান্স এবং মানবতার বন্ধু।

এরকম আরেকজন মানুষকেও আমি চিনি না যিনি শিল্প বিষয়ে এতখানি নিবিষ্ট চিত্ত এবং তাতেই হয়েছেন অগ্নিশুদ্ধ। তাঁর মুখের কথা ছিলো যেন তপ্ত অঙ্গার। আগুনের মতো আজীবন নিজেকে পুড়িয়েছেন। পরে সে আগুনই তাঁকে আপন কোলে তুলে নিলো।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের সবচে' সুখকর স্মৃতি।

আমি আশা করব যে ফরাশি তারুণ্য মাল্‌রোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।*

---

* মাল্‌রো সংখ্যা 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ (জুলাই, ১৯৭৭) পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ-রূপে প্রকাশিত। বর্তমান লেখকের "মার্ক শাগাল : সাম্প্রতিক এবং আদি-অকৃত্রিম ('শিল্পকলা,' শীত ১৩৮৪) এবং "মার্ক শাগালের অমরত্ব, ("সাপ্তাহিক বিচিত্রা,' ঈদ-পূর্ব সংখ্যা, ১৯৮৫) প্রবন্ধদ্বয়েও দুই মনীষীর সম্পর্ক-বিষয়ে মন্তব্য আছে।

শতাব্দীর কিংবদন্তী

আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। একটি সকালের কথা। তারিখটি লক্ষ্য করুন—২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৬; সকাল ৮—১৫ মিনিট। প্যারিসের উপ-কণ্ঠে অবস্থিত এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অঁদ্রে মাল্‌রো। ক'দিন ধরে তাঁর শ্বাসযন্ত্রে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এবার অবসান হলো সব কিছুর—সব দুঃখ দুর্দশা, জীবন সংগ্রাম, মুখোমুখি লড়াই, বিমান পোতে বসে বোমা নিক্ষেপ, বরফের ওপর শুয়ে নাৎসী সেনার ওপর হাল্কা মেশিন-গানের বারুদ বৃষ্টি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কিংবা পরবর্তী সংকট উত্তরণের সংগ্রামে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়, মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণের উদ্দেশ্যে উপন্যাস রচনা, সমালোচনা বা শিল্পের ইতিহাস লেখা, একযুগ মন্ত্রিত্বের মসনদে বসে থাকা, বুদ্ধিজীবীদের মতো বিবৃতি সই না করে মুক্তি সনদ নিয়ে সদ্য-স্বাধীন উপনিবেশের রাজধানীতে ফরাশি প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রবক্তা অঁদ্রে মাল্‌রো আর নেই। একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান নয় শুধু, এ যেন শতাব্দীর শেষ।

সকাল ১১টা ১৫ মিনিট—তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় এস্নান-স্থিত ভেরিয়ের ল বুইস্সোঁর বিশাল বাগানবাড়ীতে। বাড়ী তো নয় 'শাতো'। মন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর থেকে এখানেই বসবাস করছিলেন। এটা ছিলো তাঁর বান্ধবী-বাড়ী। কবি লুইজ দ্য ভিল্‌মোর্যাঁ-র সঙ্গে অনেক দিনের পুরনো বন্ধুত্ব। তাঁর আমন্ত্রণে নিঃসঙ্গ মাল্‌রো এসেছিলেন এখানে। তাঁর প্রিয় ছবি, ভাস্কর্য, বইপত্র দিয়ে তাঁর ঘর যেমন সাজানো, তেমনি গোছানো সুন্দর নীল বৈঠকখানাটি। শতাব্দীর কিংবদন্তী শুনতে কিংবা মূর্তিমান কিংবদন্তীর সাক্ষাৎ পেতে অনেকেই আসতেন এখানে।

দ্য গোল-এর মৃত্যুর পর, ১৯৭১ সালে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ইনষ্টি-টিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্য-গোল পূর্বাহ্নে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে মাল্‌রোকে সভাপতি করতে হবে। তাই হয়েছিল। সেখানে 'শোক খাতা' খোলা হলো মাল্‌রোর মৃত্যুতে।

মৃত্যুর খবরটি যে মুহূর্তে ফরাশি প্রেসিডেণ্ট জিসকার দেস্তাঁ-র কাছে এসে পৌঁছায় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক বিশিষ্ট মেহমান, মরক্কোর বাদশা হাসান। প্রেসিডেণ্ট বাদশাকে খবরটা দেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে বাদশা তার দেশের এবং নিজের পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করেন। জিসকার নিজেও মাল্‌রো-কন্যা ফ্লোরঁস্ (চিত্র পরিচালক অঁল্যা রেস্‌নের স্ত্রী)-এর কাছে প্রেরণ করেন শোকবার্তা।

অবশেষে মৃত্যু তাঁকে নিয়তির অন্তর্ভুক্ত করল। অল্প বয়েস থেকে মৃত্যু চিন্তা তাঁকে অধিকার করে বসেছিল। উদ্ভট ভাবনা, অজৈব কল্পনা তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল সারাটি জীবন—'আত্মাকে নিয়ে কী করা যদি ঈশ্বর-খ্রীষ্ট কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে?' বেশ বড়সড় দুই পুত্র একসাথে মারা গেল গাড়ী দুর্ঘটনায়। গির্জায় কবরস্থ করলেও তিনি দেখতে যান না। 'টুরিষ্ট' মনে হবে বলে। স্মরণ করেন দ্য গোলের কাছে শোনা স্তালিনের উক্তি: 'শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই জয়ী হয়।'

'আশা' নামে তাঁর একটা বই আছে (লে'স্‌পোয়ার)। বইটির অংশ বিশেষ তিনি চলচ্চিত্রেও রূপায়িত করেছেন। আজীবন তিনি হতে চেয়েছেন আশাহীনের আশা, ভাষাহীনের ভাষা। কিন্তু তাঁর রচনায় আশা-বাদ কম, নিরাশা নয়—তবে এক ধরনের শূন্যতা মাখানো ট্র্যাজিক চিন্তা-পৃথিবীর পরিবর্তন সাধনে মানব-মনীষার নপুংসকতাই যার হেতু, তাঁর সব রচনা ও ভাষণে সংগীতের মতো বাজে। শূন্যতার ঊর্ধ্বে ওঠা অবশ্য অসম্ভব নয়। তখন প্রয়োজন গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা। 'মানব পরিস্থিতি'র চরিত্র চেন বলে 'ভীতির বস্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেই প্রচুর কিন্তু আমরা কিছু একটা করতে পারি।' আরেক চরিত্র কিয়ো বলে, 'একা মরতে না হলে মরাটা যথেষ্ট সহজ।' এভাবে তৈরী হয় বিপ্লবের দর্শন। বিপ্লব পরিণত হয় ধর্মে। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে হবে সাহসী অভিযাত্রীর মতো। ক্ষুধার্তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন তাঁকে দিয়েছে এক রহস্যময় গর্ববোধ। কেন নিরাশ হওয়া মানুষের ওপর? তার চাইতে শত্রুর ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া কি যায় না? পাশাপাশি যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাদের মধ্যেই তো জন্ম নেয় পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্বের। মৃত্যুর ট্রাজিক চেতনা থেকে উত্তরণের পথ খুলে দেয় এই সৌভ্রাতৃত্ব। তবুও কি বন্ধ করা যায় হতাশার দুয়ার? বারবার একি অজানা ভীতির হাতছানি!

আরেকটি উপায় আছে। নিজের মধ্যে কল্পিত শাদুঘর তৈরী। আশ্চর্য সব মানবকৃতি ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকের পৃথিবীতে। সুমেরীয় ভাস্কর্য, মনালিজা, ভেন্যুস দ্য মিলো...এই সব শিল্প এরা তো নিয়তিকে উপেক্ষা করে চলেছে। এরাতো 'অঁতি-দেস্তাঁ', তাহলে? এদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। জানতে হবে 'দেবতাদের রূপবদল' হয় কেন? রূপমুগ্ধ মানুষ তার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতিরূপ তৈরী করছে না নতুন প্রকৃতি নির্মাণ করছে? তাঁরই উক্তি: 'শিল্পী প্রকৃতি-বিশ্বের প্রতিলিপিকর নন বরং তার প্রতিপক্ষ।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ প্রশ্ন করে চলেছে। দুর্ভাগ্য, অনেক উত্তর এসেছে নতুন প্রশ্ন হয়ে। ইতিহাস যাঁরা নির্মাণ করেন, তাঁরা কী বলেন? দেখেছে অনেক ইতিহাস-নির্মাতা--জিদ, মোরিয়াক, ভালেরী, ট্রটস্কি, গর্কি, মাও, চু-এন লাই, দ্য গোল, কেনেডি, সঁঘর, পিকাসো, শাগাল, ব্রাক, লকর-বুজিয়ে, নেহেরু, শেখ মুজিব...। তাঁর উপন্যাসের এক চরিত্র বলেছিলো: 'আত্মস্মৃতি ছাড়া আর কী আছে যা' নিয়ে বই লেখা যায়?' মাল্‌রো নিজে লিখেছেন 'অঁতি-মেমোয়ার' (বিপরীত স্মৃতি?) তাও সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাস।

শব্দ ব্যবহারে, চিন্তায় ও অভিপ্রায়ে তাঁর মতো অভিজাত ও কুশলী মানুষ এ শতাব্দী খুব বেশী দেখেনি। তাই বৃহৎ ও মহতের রূপায়ণে এই শিল্পী ও সংগ্রামী তুলনারহিত।

"... without Malraux, it would be impossible to understand some of the most powerful forces which have shaped the present all the more because in the West they have been driven underground or into silence, of which Malraux is as fond as he is of words, or else today have emerged into the light in forms so distorted and disfigured that they have become a mere travesty of what they should be and are.

Malraux's life is itself a kind of legend, part fairy story, part epic, part thriller, and like all legends, filled with mysteries, contradictions and paradoxes."

Column by 'R', *Encounter*
London, May, 1974, pp. 26-27.

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা

উত্তর ফ্রান্সের দঁকের্ক এলাকা। অঁদ্রে মাল্‌রোর পূর্ব পুরুষের বসতি এখানেই। পরবর্তীকালে তাই লিখেছিলেন, 'ওখানে আমার বায়ান্নজন 'কাজিন' আছে।' চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাইবোনের অন্ত নেই। পারিবারিক নিবাস এই সামুদ্রিক বন্দরে। নাবিকের পেশা, সমুদ্র-সম্পর্কিত ব্যবসা এই পরিবারের ঐতিহ্য। সংস্কৃতিতে এঁরা ফরাশির চেয়ে বেশী ফ্লামঁ। বেলজিয়ামের বুর্জ-এ্যাণ্টোয়ার্প প্রভৃতি শহরের দিক থেকেই এঁরা এসেছেন এদিকে। ফ্লামঁদের চরিত্রে নাকি দেখা যায়ঃ দার্ঢ্য। এক কথায় অটল থাকা এবং কাজে-কর্মে-বুদ্ধি-বিবেচনায় ঢিলেমি কিংবা বিদেশীদের কাছে চুপচাপ থাকা এঁদের স্বভাব। হাসি-ঠাট্টা উৎসব-উল্লাসে এঁরা খুব উৎসাহী। সমুদ্র-সম্পর্ক গভীর থাকার কারণে চিরদিন মাল্‌রো নিজেও ছিলেন এক ক্লান্তিহীন পর্যটক। কোনো হারানো স্বর্গের উদ্দেশ্যে দিগন্তের পরপারে যাত্রায় প্রস্তুত। যে মানব-মর্যাদার কথা আজীবন বলেছেন তিনি, ফ্লামঁ শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে রেখে গেছেন তারই সংগুপ্ত বাণী।

মাল্‌রোর প্রপিতামহ দকের্ক্‌ বন্দরে বেশ ক'টি মাছ–ধরা জাহাজের মালিক। তাঁর মৃত্যু সমুদ্রগর্ভে। কেউ কেউ বলেন, আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। পিতামহের ছিল নাবিক বা সমুদ্রবিদ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিপণী। বেজায় গর্ব তাঁর। কখনো ফ্লামঁ ছাড়া ফরাশি বলতেন না। দয়ালুও ছিলেন খুব। জিদও ছিল যথেষ্ট। এই 'একসেন্‌ট্রিক' দাদার কথা মাল্‌রো নানা প্রসঙ্গে বলেছেন পরবর্তীকালে। তাঁর 'রাজকীয় সড়ক', 'আলতেন্‌ বুগ্‌' বইয়ে এঁর চিত্র স্পষ্ট। মাল্‌রো পিতামহের প্রত্যক্ষ পরিচয় কখনো পাননি। তাঁর ৮ বছর বয়সে ৬৭ বছরের দাদুর মৃত্যু ঘটে। জন-শ্রুতির ফলে দাদুর ভাবমূর্তি ক্রমে বড় সড় হতে থাকে কল্পনাপ্রিয় নাতির কাছে। ১৯৪০ সালে হিটলারী বোমাবর্ষণে তাঁদের পূর্বপুরুষের বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে যায়।

মাল্‌রোর পিতা ফেদ্‌রঁ-জর্জ ছিলেন অন্যধাতুর মানুষ। দশাসই চেহারা। শক্ত, সুন্দর সুবেশ, নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত—যেন মোপাসঁ-র কোনো এক

নায়ক। একবার স্পেনে কাটিয়ে তিনি খুব বিরক্তবোধ করলেন। সেই থেকে আর কখনো বিদেশে যাননি। এটা আর ফ্লামঁ নয়, অনেকটা ফরাশি চরিত্র। এরকমভাবে ঘাটের দশক অবধি অনেক ফরাশি দেশের বাইরে ভ্রমণে বেরুতেন না। যাহোক, ফেরনঁ-জর্জ প্রথম মহাযুদ্ধে ট্যাংকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটি ছোটখাট অফিসারের পদমর্যাদায় 'ভের্দ্যা' এলাকায় যুদ্ধ করেছেন(এখানকার যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লেখা নজরুলের 'ভার্দুন ট্রেন্চ ক্রান্স' নিশ্চয়ই অনেকের পড়া আছে। এক অবিস্মরণীয় কথিকা!) যুদ্ধের সময়কার একটি ফটোগ্রাফে তাঁকে বেশ গর্বিত ও হাস্যোজ্জ্বল দেখায়। যুদ্ধের পর নানা কাজকর্ম করেছেন, ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনেও ছিলেন। কিন্তু কোনটাতে যে খুব সাফল্য এসেছে তার কোন প্রমাণ নেই। নানাকিছু আবিষ্কার বা তৈরীর নেশাও হয়তো তাঁর ছিলো। মাল্‌রোর 'রাজকীয় সড়ক' উপন্যাসে নায়কের পিতাকে আঁকতে গিয়ে সম্ভবত নিজের পিতার কথা ভেবেছেন।

শতাব্দী-সূচনার আগমুহূর্তে তাঁর বিয়ে হয় জুরা এলাকার কৃষক-কন্যা বের্থ লেমির সঙ্গে। বরের বয়স ২৫, কনের ১৯; সুন্দরী হাল্কা-পাতলা দীর্ঘাঙ্গী তাই দেখতে আরো কম বয়সের মনে হতো। সবাই বলে, খুব মানিয়েছে, দু'জনকে। বিয়ের ক'দিন পরই তাঁরা প্যারিসে চলে আসেন। বাসা করেন মোমার্ত এলাকায় –উঁচু জায়গায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের গরীব পাড়া। উপকূল থেকে উপত্যকার বাশিন্দা।

মোমার্তের বাড়ীতে ১৯০১ সালের ৩রা নভেম্বর। এই দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র সন্তান জর্জ-অঁদ্রে মাল্‌রো। পরে বাদ দেওয়া হয় জর্জ। ১৯০৫ সালে সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরে। বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে যায়। মাল্‌রো-মাতা তাঁর মায়ের বাড়ী চলে আসেন। মাল্‌রোর বাবা আরো অনেক পরে অন্য বিয়ে করেন এবং সে স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে আরো দু'টি পুত্র-সন্তান। ১৯৩০ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। বোঁদির শহরতলীতে, প্রায় গ্রামীণ পরিবেশে শিশু মাল্‌রো বড় হতে থাকেন প্যারিস থেকে বারো কিলোমিটার মাত্র দূরে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত মফস্বল এলাকা বোঁদি। আলোহীন এক নিরানন্দময় পরিবেশ। রুটি-বিস্কুটের দোকানদারের বিধবা পত্নী তাঁর নানী। খালার ছিল একটি মুদীর দোকান। তারই ওপরতলায় তিন রমণীর স্নেহচ্ছায়ায় একটিমাত্র আদুরে শিশু আমাদের অঁদ্রে মাল্‌রো। কিন্তু

চারিদিকে ছড়ানো হতাশার রাজত্ব। অবশ্য প্রেরণা লাভের একটি স্থল ছিলো বালক মাল্‌রোর। তাঁর নানী ছিলেন এক অসামান্যা জীবনীশক্তিসম্পন্ন ইতালীয় বংশোদ্ভব মহিলা। যা' হারিয়েছেন তার জন্য খুব একটা দুঃখ নেই, যা' আছে তা' দিয়ে মানিয়ে চলার অদম্য মনোবল তাঁর। তাছাড়া তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী। পড়ালেখার অভ্যাসও ছিল। তাঁর অস্তিত্বে সহজাত আত্মনির্ভরতা এবং এক ধরনের গর্ববোধ এই ছোট্ট পরিবারটির সব সদস্যের মধ্যে সংক্রমিত।

যত বড় হচ্ছেন অঁদ্রে, ততই বিরক্তি বাড়ছে। তিন রমণীর আদর-উষ্ণতা তাঁকে অধৈর্য করে তুলছে। পরবর্তীকালে কেউ তাঁকে শৈশব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো সুখকর স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইতেন না। আত্মস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন : 'যত লেখককে জানি, তাঁদের প্রায় সবাই শৈশব পছন্দ করতেন। আমারটাকে আমি ঘৃণা করি।' এর কারণ নির্ণয় খুব সহজ নয়। অর্থকষ্ট, আদর-যত্নের অভাব ছিল—এমন বলা যাবে না। বুর্জোয়া ছেলেপুলে কেউ কেউ "মুদিনীর ব্যাটা" বলে ঠাট্টা করতো অবশ্য। একটু বেঢপ কান; চেহারা সুরতে হয়তো কিছুটা ঢ্যাঙা—ছোট্ট অঁদ্রে কিন্তু পড়াশুনা ভালোই করতে লাগলেন। তবে এক নার্ভাস কাঁপুনি আশৈশব চাঁদের কলঙ্কস্বরূপ রইলো। পাঁচ বছর বয়সে বোঁদি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। স্কুলে মোট ১৮ জন ছাত্র। এ সময়কার এক বন্ধু লুই শভাস্সোঁ-কে পঁয়ষট্টি বছর ধরে প্রায়ই কাছের মানুষরূপে পেয়েছেন। স্কুলে ইতিহাস, মাতৃভাষা, বিজ্ঞানে তিনি ভালো ছিলেন। তাঁর রচনা হতো উৎকৃষ্ট। এলাকার সাধারণ পাঠাগারে তিনি যেতেন পড়তে ও বই ধার নিতে। পরে এ ব্যাপারে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে সাহায্যও করতেন। মোটকথা, খুব একটা অসুখী হবার মত তেমন কিছু আপাতদৃষ্টিতে ঘটেনি মাল্‌রোর জীবনে। সপ্তাহে একদিন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা হতো। কখনো নাকি মা'র সঙ্গে যেতেন পিতৃসন্নিধানে। ৮।৯ বছর বয়সে তিনি আলেকসঁদ্‌র দ্যুমার উপন্যাস 'জর্জ' পড়েন। বইটি তাঁকে খুব প্রভাবিত করে। বইটির কাহিনী হলো—এক ইংরেজ উপনিবেশের গভর্ণরের সঙ্গে আধা-ফরাশি, আধা-কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ মুনিয়ে-র আমৃত্যু যুদ্ধ। কালোধলোর জগতে অধিকারের প্রশ্ন, মৃত্যুচিন্তা ইত্যাদি তাঁর খুদে মাথাটি দখল করে ছিলো কিছুকাল। শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' পড়েও অভিভূত হয়ে পড়েন মাল্‌রো। তাঁর বয়স যখন তের ইউরোপে

শুরু হলো রক্তক্ষয়ী প্রথম মহাযুদ্ধ। চারিদিকে এত মৃতদেহ, কবর দেবার অবকাশও নেই। অনেকগুলো দেহ জড় করে পোড়ানো হতো প্রায়ই। বারান্দায় যখন রুটি খেতে বসতেন মরা পোড়া ছাই এসে পড়তো পাতে। আতঙ্কে ওরা রুটি ছুঁড়ে ফেলতো। কৈশোরের এই কাহিনী স্মরণ করে পীড়িত হতেন অঁদ্রে মাল্‌রো।

চৌদ্দ বছর বয়সে প্যারিসের এক মাধ্যমিক স্কুলে তিনি ভর্তি হন। তুর্গো স্কুল। সকালে বন্ধু লুই শভাস্সোঁর সঙ্গে ট্রেন ধরতেন। খুশী হলেন বোঁদির বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হয়ে। সন্ধ্যায় ফিরে আসতে হতো, এটাই দুঃখের। প্রথম বছর পরীক্ষায় (১৯১৫-১৯১৬) ইতিহাস ও অংকবিদ্যায় প্রথম, বানানে দ্বিতীয়, ফরাশি সাহিত্যে ও ইংরেজিতে তৃতীয়, ভূগোল ও অংকে চতুর্থ, রচনায় পঞ্চম এবং রসায়ন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানে ষষ্ঠস্থান অধিকার করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল আরো ভালো হতে থাকলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে তিনি বোঁদির এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়েছিলেন। তাঁর নাম পোলেৎ থুভ্‌ন্যা। পরে পোলেৎ মাল্‌রোর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, চুপচাপ থাকলে কী হবে নিজেকে বেশ বড় ভাবতে অভ্যাস ছিল মাল্‌রোর। জংলীদের মতো এক রোখা। মাল্‌রো খুব পড়তেন। আর পড়ে মনে রাখতে পারতেন। কথাবার্তায় ঠিকমত উদ্ধৃতি দিতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। পোলেতের সঙ্গে সাড়ে তের বছরের মাল্‌রো ও সহপাঠীদের একটি ছবি আছে। সেই ছবিতে দেখা যায় মাল্‌রোই কেবল ঘড়ি পরিহিত। ওয়েষ্ট কোটে চেইন বাঁধা। সোনার কিনা জানা যায় না। তবে সৌখিনতার নিদর্শন নিঃসন্দেহে। পরবর্তীকালে যথেষ্ট সৌখিন ছিলেন মাল্‌রো, বিশেষত দামী শিল্পবস্তু সংগ্রহে আর সবচে' ভালো রেস্তোরাঁয় আহারে ও আপ্যায়নে।

যাহোক, তুর্গো স্কুলের পরিবেশও তাঁকে আনন্দ দিতে পারলো না বেশি দিন। লিসে কোদর্সে নামক একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পড়বার প্রয়াস পান। কিন্তু তা' সম্ভব হয়নি। একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটলো আর মাল্‌রোও স্কুল ছাড়লেন। কিন্তু পড়াশুনায় ডুবে রইলেন তিনি। এটা হয়তো অন্য অনেকের ক্ষেত্রেও ঘটে। তবে এ ক্ষেত্রে যা' ব্যতিক্রম সেটি হলো, তিনি যেন জানতেন কী পড়ছেন, কেন পড়ছেন আর কোন্‌টা পড়বেন। স্কুলের বাঁধাধরা পড়া, গুরুদের একগুঁয়েমি ছিলো তাঁর একান্ত অপছন্দ। ফরাশিদের

প্রবেশিকা 'বাকালরেয়া' পাশ করা আর হলো না তাঁর। কিন্তু মহাজীবনে প্রবেশের দীক্ষা ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। লুই শভাস্নোঁ ও আরেক বন্ধু মার্সেল্ ব্রদ্যাঁর সঙ্গে নাটক, চলচ্চিত্র ছাড়াও যাদুঘর ও প্রদর্শনী দেখা এবং সঙ্গীত শোনার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। বলতে গেলে অযথা কাল-ক্ষেপণ করেন নি তিনি। এভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন শৈশব থেকে যৌবনের পথে।

যৌবন-জল-তরঙ্গ

চারদিকের অস্থির পরিবেশ কিশোর মাল্‌রোকে ঠেলে দিচ্ছিল তাঁর নিজস্ব ভুবন সৃষ্টির কথা ভাবতে। যুদ্ধ একদিকে যেমন সংগ্রামীস্পৃহা জাগালো তেমনি অন্যদিকে শান্তির প্রয়োজনীয়তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলছিলো। নানা ঢেউয়ের রাজনীতির বাতাসও বইছিলো জোরেসোরে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ধাক্কা এসে পড়লো তখন প্যারিসে। বাম-ভাব বিরাজ করছে সর্বত্র। মুরুব্বী ও বন্ধুবিহীন, ডিগ্রী ছাড়া মাল্‌রো শুধু নিজের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, নানা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও আত্মসম্মান সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সংসার সমরাঙ্গনে। একজন বড় লেখক তাঁকে হতে হবে। বেশ, তাহলে বোদ্‌লের-এর মত আশ্রয়হীন, সহায়হীন কঠোর জীবনও যাপন করতে হবে। তাও রাজী। রাজধানীর দু'চারজন বড় লেখকের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। যেমন, ফ্রসোঁয়া মোরিয়াক।

মাদলেন-মন্দিরের কাছে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্লভ এবং দামী সংস্করণের বিশেষ বইয়ের দোকানে তিনি কাজ পেলেন। বোঁদির বাসা ছেড়ে প্যারিসে আস্তানা গাড়লেন। প্রথম দিকে বাবার কাছ থেকে কিছু মাসো-হারা পেতে লাগলেন। ক্রমে স্বনির্ভর হয়ে প্যারিসের বোহেমীয় সাহিত্যিক জীবনের আস্বাদ নিতে শুরু করলেন। মাল্‌রো মাসিক 'লা কনেসঁস্" (জ্ঞান) নামে একটি পত্রিকা বের করলেন। সেখানেই মাল্‌রোর প্রথম লেখা, একটি প্রবন্ধ 'কিউবিষ্ট কবিতার সূত্রপাত' বেরোয়। এই সময় মাল্‌রোর সম্পাদনায় ফরাশি সাহিত্যের বেশকিছু বিস্মৃতপ্রায়, মূল্যবান ও কৌতুকপূর্ণ রচনার প্রকাশ ঘটে। প্রকাশনার রাজ্যে এসে তাঁর কর্ম-প্রতিভার পরিচিতি ও বিস্তৃতি ঘটে। অবশ্য তাঁর সম্পাদনার কাজে তাড়াহুড়োর ছাপ ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছেন কোন কোন সমালোচক। কর্মক্ষেত্রে মাল্‌রো অল্পদিনের মধ্যে দুটো প্রকাশকের ঘর ঘুরে এলেন। সচিত্র বইপত্র প্রকাশে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার শুরু হলো এসময়। নানা সমালোচনামূলক লেখার মধ্যে শিল্প সম্পর্কে অধ্যয়নের আগ্রহও চলল বেড়ে, বেশ কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হলো। এ শতাব্দীর তিন দানব—পিকাসো, শাগাল ও ব্রাক্ হয়ে গেলেন

বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। উদীয়মান ও পরিচিত লেখক তো আছেনই তখন থেকে মাল্‌রো চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকে উত্থাপন করেছেন। বন্ধুদের প্রতি তিনি ছিলেন আশ্চর্য উদার। বন্ধুদের নিয়ে বার-রেস্তোরঁয় যাওয়া তো নিত্য-নৈমিত্তিক এবং দিনে একাধিকবার ঘটতো, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খরচ বহনের পালা ছিলো তাঁরই। রনে লাতুশ নামে এক বন্ধু দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতির জন্যে আত্মহত্যা করলে তিনি অনেকদিন সে দুঃখ ভুলতে পারেন নি। আট বছর পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস এই বন্ধুর স্মৃতিতে উৎসর্গ করেন। বন্ধুদের প্রতি আনুগত্য ও ঔদার্য তাঁর শেষ জীবনেও, বিশেষ করে মন্ত্রী থাকার আমলেও দেখা গেছে। গোড়ার দিকে তিনি যেসব কাগজে লিখতেন তার বেশীর ভাগই ছিল বামপন্থী কাগজ। কিন্তু তিনি নিজে অরাজনৈতিক ছিলেন। গভীর দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের দিকে ছিল তাঁর প্রবণতা। সাহিত্যিক তিন বন্ধু—গাবোরি, লাতুশ ও পাস্কাল পিয়া ছাড়া একজন শিল্পী গালানিসের সঙ্গে তার জন্মে গভীর অন্তরঙ্গতা। তবে তাঁর বেশী কাছের বন্ধু ছিলেন মার্সেল আর্‌লঁ। এঁর সংস্পর্শে এসে তিনি শিল্পকলার ইতিহাসে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাছাড়া তিনিই বিখ্যাত প্রকাশক গালিমার-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে এবং ইন্দোচীনের এডভেঞ্চার সহায়তা করেন মাল্‌রোকে। অল্পদিনের মধ্যে মাল্‌রোর পরিচয় ঘটলো আরেক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি, অঁরি কাঅনভেইলার। প্রসিদ্ধ শিল্প ব্যবসায়ী—ব্রাক, পিকাসো তথা সব বড় বড় শিল্পীর আশ্রয়দাতা। প্রখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক মাক্স জাকব মালরোকে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মাল্‌রো এখানে 'দ্য লুক্স' যাকে আমরা ভুলক্রমে 'ডিলাকস' বলে জানি) সংস্করণের প্রকাশনার দায়িত্বে থাকেন। তাঁর নিজের বইও প্রকাশিত হয় এখান থেকে—জুয়ান গ্রিস, ব্রাক্, ফেরনঁ লেজের প্রমুখের শিল্পকর্ম সমেত। উনিশ বছর বয়সে প্যারিসের মতো শহরে এ-এক দুর্লভ সাফল্য বলতে হবে। বইয়ের নাম 'লুনজঁ পাপিয়ে' (কাগুজে চাঁদ, এপ্রিল ১৯২১) অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত বইও। নবলব্ধ চিত্তের স্বাধীনতা, সাহিত্য ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর নবীন প্রকাশ এতে আছে।অবশ্যই মাকস জাকবকে উৎসর্গীকৃত। পরবর্তীকালে এই সময়ের সাহিত্যিক পরিবেশ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : মাকস জাকবের মাধ্যমে আপলিনের -এর প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। তাছাড়া বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে

নীটশে তো রয়েছেনই। লাফর্গ, লোত্রেয়ামোঁ এবং করবিয়ের লেখা তো আছেই। স্যুর্‌রেয়ালিস্‌ত আন্দোলনের সূত্রপাত আরো পরের ঘটনা, মাল্‌রো যখন ইন্দোচীনে। তাঁদের কাছে এসময়কার সেরা তিনজন ফরাশি লেখক ছিলেন ক্লোদেল, জিদ এবং স্যুয়ারেস্‌। বিভিন্ন লেখায়, বিশেষ করে প্রকাশিত গ্রন্থে, মাল্‌রো স্যুররেয়ালিস্ত-পূর্ব ধ্যান-ধারণার পরিচয় রেখেছেন। এই সময়ে তিনি প্যারিসের বিব্‌লিওথেক নাসিওনাল্‌ তথা জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। আর ছাত্র না হয়েও কিছুদিন প্রাচ্য ভাষার জাতীয় বিদ্যালয়ে চীনা ও ফার্সী ভাষার ক্লাস করতেন। তাছাড়া যখন খুশী যাদুঘর, শিল্প-সংগ্রহশালায় ঘুরে বেড়াতেন, বন্ধুদের আসরে তিনি প্রায় থাকেন চুপচাপ কিন্তু যখন মুখ খোলেন তখন বেরিয়ে আসে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ।

এই সময় মাল্‌রোর জীবনে এলেন এক নারী। ক্লারা গোল্ডস্মিথ। জর্মন ইহুদী বংশোদ্ভব। ধনী এবং সাহিত্য-শিল্পে আগ্রহী। তাঁর বয়সও বিশ বছর। মাল্‌রোর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়, অবশেষে ইন্দোচীনের অভিযান ইত্যাদি সব কাহিনী তাঁর কয়েক খণ্ড আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। ক্লারা ছিলেন একটু বেঁটে খাটো কিন্তু নীল-সবুজ চোখ নিয়ে বেশ সুন্দরী। তখন তাঁর অনুবাদ বেরিয়েছে এক সাময়িক পত্রিকায় যেখানে মাল্‌রোর লেখাও রয়েছে। ফরাশি দেশে তখন বা এখনও সাময়িক পত্রিকাগুলো হচ্ছে প্রধানত একটি গোষ্ঠীর ব্যাপার—যাঁরা পত্রিকার লেখক তাঁদের বলা হয় 'কল্লাবরাত্যর' (সহযোগী)। পত্রিকার পক্ষ থেকে দেয়া এক ডিনারে দু'জনের সাক্ষাৎ। আলাপ হয়নি খুব বেশী। দু'জন দু'জায়গায় বসে ছিলেন। কিন্তু ডিনারের পরে ক্লারা ও তাঁর বান্ধবী মাল্‌রো এবং কবি ইভঁ গল-এর আমন্ত্রণে গেলেন 'বিপ্লবী গুহা' নামে এক নাইটক্লাবে। দিনকয়েক পর আবার তাঁরা মিলিত হলেন ক্লের ও ঈভঁ গল-এর বাড়ীতে। শাগাল, দ্যলোনে প্রভৃতি অনেক শিল্পীর আড্ডা চলছিল সেখানে। কিন্তু দুই প্রেমিক এক জানালার ধারে বসে ফিসফাস কথা বলে চলেছিলেন। ক্লারার অন্য এক প্রেমিক তাঁকে সাবধান করে গেল যে মাথায় 'বিদ্যা' ছাড়া ছেলেটার আর কিছু নেই। এদিকে অঁদ্রে তাঁকে বলছে, মাক্‌স্ জাকব ছাড়া আপনার মতো বুদ্ধি আমি কারু দেখিনি। ক্লারা ছিলেন যথেষ্ট মুক্তপক্ষ। মা ও দু'ভাইর তেমন জোর-জবরদস্তির মানসিকতা নয় যদিও অঁদ্রে-ক্লারা মেশামেশি তাঁরা খুব পছন্দও করছিলেন না। এক নৈশ অভিসারে তাঁদের কিছু

বিপত্তি ঘটলো। মাল্‌রো আহত হলেন। তাঁর বাঁ হাত রক্তাক্ত। ক্লারা তাঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সিতে। বিপদ মানুষকে কাছে টানতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে দু'জন দু'জনের খুবই কাছে চলে এলেন। এরপর অঁদ্রে তাঁর বাবার কাছে বিয়ের কথা তুললেন। তিনি মত দিলেন না। তাঁর অমতের কারণ বোঝা গেল না—এটা অঁদ্রের বয়স কম বলে না ক্লারা জর্মন ইহুদী বলে।

এদিকে ঝামেলা এড়ানোর জন্য ক্লারার মা মেয়েকে ইতালী ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েকে ট্রেনে তুলে যেই তিনি নেমে পড়েছেন অমনি মাল্‌রো সেখানে ঢুকে পড়লেন। ফ্লোরেন্স পৌঁছে ক্লারা মাকে তারবার্তা পাঠালেন যে তিনি এখন বাগদত্তা। মা হবু জামাইকে রেখে বাড়ী ফেরার জন্য নির্দেশ দিলেন মেয়েকে। প্রেমিক-যুগল ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ইতালীর আশ্চর্য সব শিল্পকর্ম দেখে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো পয়সা ফুরিয়ে গিয়ে। ফিরতে হবে এবার। ফিরে যথারীতি বিয়ে হলো ক্লারার। ইচ্ছে ছিলো কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক। মাল্‌রো বললেন, বেশ—মন্দির, সিনাগগ্, গির্জা, মসজিদ, প্যাগোডা সব ক'টাতে নিয়ে যাবো। কথা রেখেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে ক্লারাকে বিশ্বের সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিয়ে গিয়েছেন। উপাসনার খাতিরে নয়। তাদের ভাস্কর্য বা শিল্পকর্ম দেখানোর জন্যে। বিয়ের সময় কোথাও আর যাওয়া হয়নি। মেয়রের ঘরে বিয়ের পর বেরুতে গিয়ে ক্লারার এক খালা নাকি মন্তব্য করেছিলেন, 'ছেলের চাইতে বাপটিকে পছন্দ করলেই পারতিস।' নবদম্পতি বেশ কিছুদিন ধরে ফ্রান্স, জর্মনী ও বেলজিয়মের বিভিন্ন অঞ্চলে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের আত্মীয় স্বজনদের দর্শন দিয়ে এলেন। এই সাথে অনেক অজানা শিল্প ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গেও পরিচয় হলো তাঁদের। এসব কাহিনী যথেষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছেন ক্লারা তাঁর আত্মজীবনীতে। মাল্‌রো বলতে গেলে এ ধরনের ব্যক্তিগত স্মৃতি বা অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি কখনো।

বিয়ের পর সমস্যা দেখা গেল রুজি-রোজগার নিয়ে। আগের চাকরী ছেড়ে দিলেন মাল্‌রো। শ্বাশুড়ী অবশ্য অভিজাত এলাকায় তাঁদের বাড়ীর তেতালার একাংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন মেয়ে ও জামাইকে। কবি ইভঁ গলের সঙ্গে মিলে মাল্‌রো প্রথমে জর্মনী থেকে চলচ্চিত্র আমদানী ও পরিবেশনার ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু সুবিধা হলো না। এরপর সমালোচক পাসকাল

পিয়ার সঙ্গে কিছু আপত্তিকর বইপত্র বিক্রির ব্যবসা। তাও জুৎসই হলো না। তারপর তাঁকে দেখা গেল শেয়ার মার্কেটে ঘোরাফেরা করতে। ক্লারার পিতা রেখে গিয়েছিলেন মেক্সিকোর কয়লার খনির প্রচুর শেয়ার। এগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়া, কখনো নতুন শেয়ার কেনা চলছিল, এদিক-ওদিক ভ্রমণের সাথে। মাল্‌রো ক্লারাকে এক সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গিয়ে বললেন 'এবার কিন্তু কোটিপতি।' ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে ওঁরা জানলেন যে আসলে তাঁদের ভরাডুবি হয়ে গেছে। এরমধ্যে মাল্‌রোর লেখা যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তা' নয়। বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখা ও কাজে বিয়ের আগের বছরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষীপ্রতা ছিলো না। লোকে ভাবলো, মাল্‌রো বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছেন নতুন নেশায়। এবছরগুলো আসলে যন্ত্রণাময় প্রস্তুতির সময়। মাল্‌রো নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন এডভেঞ্চারের জন্যে। অভিযানের অভিজ্ঞতা ছাড়া নতুন কিছু দেয়া যাবে না, এতে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। অজানা-অচেনা বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করতে তিনি যথাযথভাবেই প্রয়াসী হলেন। এতে ক্লারা, তাঁর স্ত্রী হলেন এক যথার্থ সাধন-সঙ্গিনী।

বাঁচার মতো বাঁচা

শেয়ার বাজারের মন্দা মাল্‌রো দম্পতির আয়াসের জীবনে অশান্তি আনল। এক সময় মাল্‌রো জানালেন, তাঁর মাথায় একটা 'আইডিয়া' এসেছে। তাঁরা বেরুবেন এক 'এডভেঞ্চারে', ইন্দোচীনের 'রাজকীয় সড়ক' ধরে। ছেলেবেলা থেকে মানচিত্র, পুরাকীর্তি ও শিল্পবস্তুর প্রতি প্রচুর আগ্রহ মাল্‌রোর। এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দিয়ে যুগপৎ সন্দেহপ্রবণ ও বিমুগ্ধা ক্লারাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কম্বোডিয়ার অসংখ্য মন্দির তালিকাভুক্ত ও মেরামত করা হলেও সেখানকার জঙ্গলে এখনো কিছু ভাঙ্গা মন্দির রয়েছে। আর সেগুলোতে আছে অমূল্য সব ভাস্কর্য। এর কয়েকটি উদ্ধার করে পাশ্চাত্যের যাদুঘরগুলোতে বিক্রি করতে পারলে বাকী জীবন পায়ের উপর পা রেখে সাহিত্য সাধনায় অতিবাহিত করা যাবে। ক্লারা তো 'অন্য কোথা অন্য কোন খানে'র জন্য সদা-উৎসুক—মাল্‌রোর পরিকল্পনা, পড়াশুনা ও গবেষণা তাঁকে যাত্রা শুরুর জন্য ব্যস্ত করে তুললো। বাল্যবন্ধু লুই শভাসেঁা সপ্তাহ দুয়েক পর তাঁদের সাথে যোগ দেবেন তাই ঠিক হলো। ১৯২৩ সালের ১৩ই অক্টোবর। মার্সেই বন্দর থেকে ছাড়লো 'অঁগ্‌কর্' জাহাজ। দীর্ঘ ২৯ দিনের সমুদ্র যাত্রা। তাঁরা দুজনে হলেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। দু'তিন মাস বিদেশ বাসের উপযুক্ত পয়সা-কড়ি, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়ে চললেন তাঁরা। জাহাজে উঠেই মাল্‌রো দম্পতির পরিচয় ঘটে ক্লেদাক্ত ঔপনিবেশিক পরিবেশের সঙ্গে। এই ভ্রমণের এবং পরবর্তী লোমহর্ষক বা বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর কাহিনী মাল্‌রোর 'রাজকীয় সড়ক', ক্লারার 'আমাদের পায়ের আওয়াজ' অথবা মার্কিন অধ্যাপক ওয়াল্টার ল্যাংলোয়ার 'অঁদ্রে মাল্‌রোর ইন্দোচীন এডভেঞ্চার' বইতে পাওয়া যাবে।

সমুদ্র ভ্রমণ ছিল যথেষ্ট আরাম ও আনন্দদায়ক। সফল হতে যাচ্ছে স্বপ্ন—রূপ কথার কাহিনীর মতো, এমন এক ধারণা নিয়ে তাঁদের যাত্রা। বিরতি ঘটলো জিবুতিতে। র‍্যাঁবোর স্মৃতি-বিজড়িত এই বন্দরে আনোদ-প্রমোদের

জন্ম : ৩/১১/১৯০১ মৃত্যু : ২৩/১১/১৯৭৬

পিতার সঙ্গে কিশোর মাল্‌রো, ১৯১৭

বীরপ্রসবিনী মাতা : বের্থ লেমি–

মাদ্‌লেন ও মাল্‌রো, ১৯৪৭

মাল্‌রোর দুই পুত্রের জননী : জোজেৎ ক্রতিস

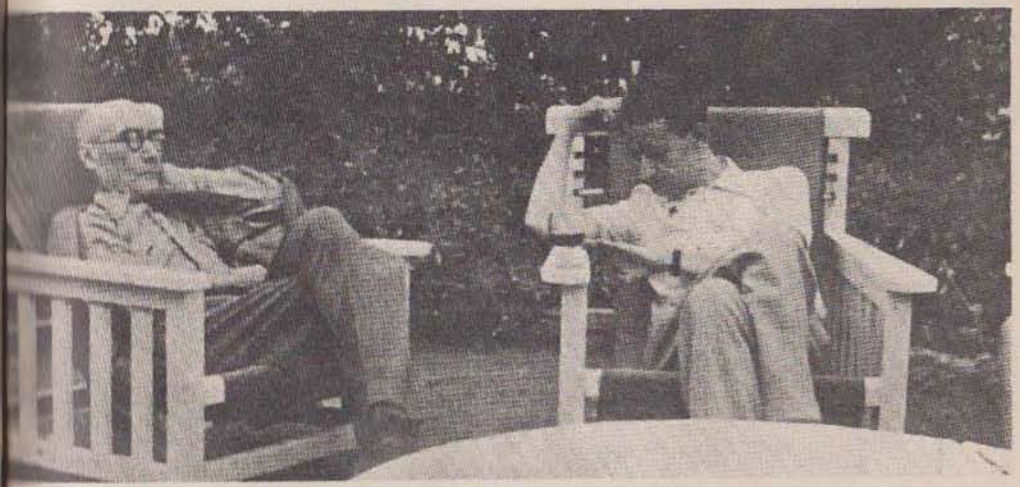

মাল্‌রোর বাড়ীতে অঁদ্রে জিদ। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, ১৯৪১

মাল্‌রো ও তাঁর কন্যা ফ্লোরঁস, ১৯৫০

দুইপুত্র ভ্যাঁস ও গোতিয়ে, পিতার আনীত-রেড-ইন্ডিয়ান খেলনাসহ,১৯৫৩

সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসরের বন্ধু শভাস্সোঁ-র সাথে। সাইগন, ১৯২৪

গর্কি'র সঙ্গে তাঁর বাগানে, ১৯৩৪

মাল্‌রো ও আইজেন্‌স্টাইন : মস্কো, ১৯৩৪

স্পেনে দু-ই-বিমান আক্রমণের মধ্যে অবকাশ-যাপন, ১৯৩৬

মাল্‌রো, মেয়েরহোল্ড এবং বরিস প্যাস্টেরনাক, ১৯৩৪

আঁদ্রে মাল্‌রো ও ইলিয়া এরেনবুর্গ : খার্কভ লেখক সম্মেলন, ১৯৩৪

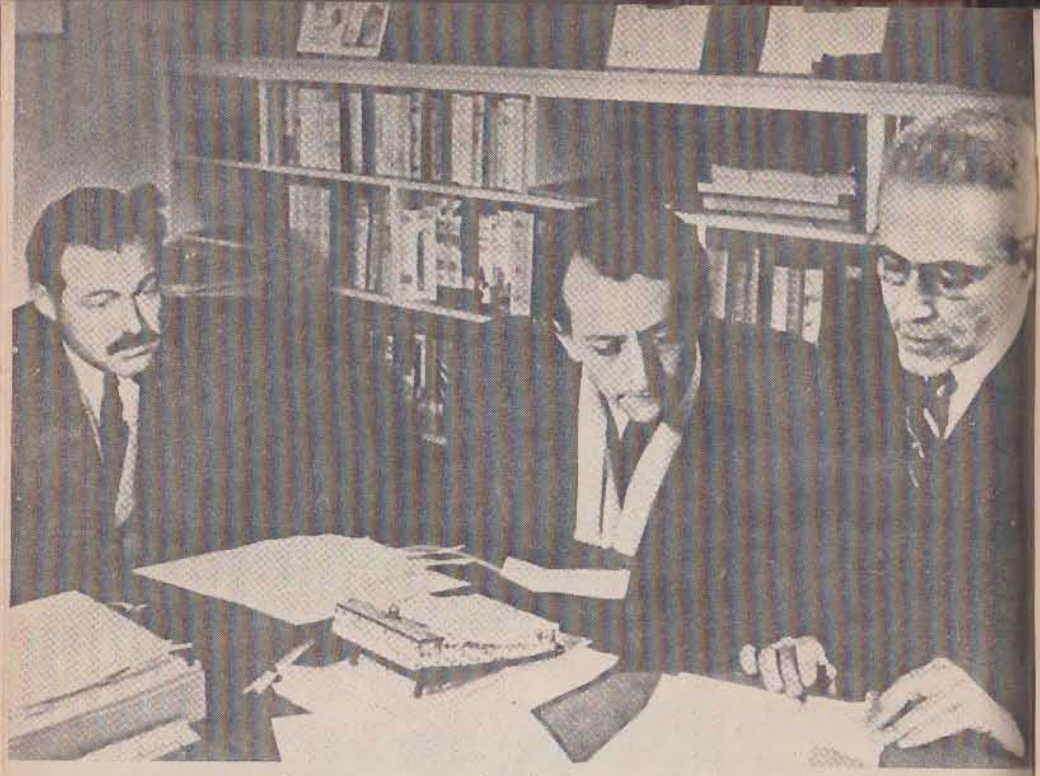

হেমিংওয়ে, মাল্‌রো এবং তাঁর মার্কিন প্রকাশক ১৯৩৭

ছায়াছবি 'এসপায়ার'-এর পরিচালক মাল্‌রো। বার্সেলোনা, ১৯৩৮

ছিল উত্তম ব্যবস্থা। এরপর কলম্বো, পেনাঙ দ্বীপ, সিঙ্গাপুর, (সেখানে ক্লারা এক দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান) সাইগন ছুঁয়ে পৌঁছুলেম হ্যানয়ে। হ্যানয় শুধু ফরাশি উপনিবেশের প্রধান কর্ম কেন্দ্র নয়, দূরপ্রাচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে এখানে। পুরাতত্ত্ব গবেষণার কেন্দ্রও। মাল্‌রো সেই প্রতিষ্ঠানে ঔপনিবেশিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত একটি পত্র দাখিল করলেন। খ্মের শিল্পের সেরা বিশেষজ্ঞ অঁরি পারমঁতিয়ে-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। তিনি মাল্‌রোদের সঙ্গে প্নোম-পেন অবধি চললেন। তাঁর 'ইন্দবর্মনের শিল্প' গ্রন্থটি মাল্‌রো প্যারিসে ভালোভাবে পড়ে এসেছেন। মাল্‌রো যে পোড়ো মন্দির থেকে মূর্তি উদ্ধার করবেন বলে ঠিক করেছেন সেই বঁতে-স্রেই-র মন্দির তাঁর অচেনা নয়। পণ্ডিত হলে কী হবে, অঁরি ছিলেন বেশ আমুদে আর সহানুভূতিপ্রবণ। তাঁর সঙ্গে মাল্‌রো দম্পতির খুব জমল। ইতোমধ্যে বন্ধু লুই শভাসোঁও এসে পড়েছেন প্যারিস থেকে। অবশেষে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বঁতে-স্রেইর মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো। এ-এক অভিযান বটে। অভিযাত্রীদের সবার জন্য ঘোড়া। মূর্তি বহন করে আনবার জন্য চারটি মোষের গাড়ী। জনাকয়েক স্থানীয় পথপ্রদর্শক। বেশ কষ্টসাধ্য অভিযান বলতে হবে। জঙ্গলের ভেতর তিন দিন পথ চলার পর, অবশেষে পাওয়া গেল হারিয়ে যাওয়া সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দু'-তিন জন মানুষের সমান মাপের আস্ত ও ভাঙ্গা মূর্তিও কিছু পাওয়া গেল। কিছু দাঁড়িয়ে, কিছু মাটিতে পড়ে, সাপে ঘেরা। মূর্তিতো পাওয়া গেল কিন্তু দেয়াল থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা শক্ত প্রতিপন্ন হল। প্যারিস থেকে আনা যন্ত্রপাতি, কাঁচি অনেকগুলোই গেল ভেঙ্গে। দু'দিনের চেষ্টায় শেষ অবধি দুটি আস্ত ও পাঁচটি ভাঙ্গা দেবমূর্তি বাক্সবন্দী করে মোষের গাড়ীতে তোলা হলো। ২৪শে ডিসেম্বর তাঁরা ফিরলেন প্নোম-পেন শহরে। কিন্তু মধ্যরাতে এলো পুলিশ। ঘুম ভাঙ্গিয়ে মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করে আনার অভিযোগ আনল। বাক্সপ্যাঁটরা খুলে তারা মূর্তিগুলো দেখলো। তারপর পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত শহরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

মাল্‌রো ও তাঁর সঙ্গীদের এই অবস্থান হয়ে উঠল অত্যন্ত কষ্টকর। শহরের সেরা হোটেলেই তাঁরা ছিলেন। কিন্তু সে হোটেল আদৌ বাসযোগ্য ছিল না। এর মধ্যে ক্লারার শুরু হলো জ্বর। এদিকে পুলিশের আদেশ আর

আসে না। তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। এভাবে কাটল মাসের পর মাস। অবশেষে প্যারিস থেকে মাল্‌রো ও তাঁর দুই সঙ্গী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য নিয়ে এলো পুলিশ। কিন্তু সাজালো নিজেদের খেয়াল খুশী মতো। এদিকে ক্লারার অবস্থা গেলো আরো খারাপের দিকে। তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হলো। জুলাই মাসের গোড়ায় (১৯২৪) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাঁকে ফেরত পাঠানো হলো ফ্রান্সে।

সাতমাস গড়িমসী করে ১৬ই জুলাই মাল্‌রোদের কেস উঠলো কোর্টে। উপনিবেশের বিচারকটি সম্পর্কে আধুনিক জীবনীকারেরা অনেক বিরূপ-মন্তব্য করে গেছেন। শান্ত কণ্ঠে সব চেয়ে কড়া সাজা দিতে নাকি তাঁর জুড়ি ছিল না। স্থানীয় ফরাশিরা, বিশেষ করে একটি ফরাশি পত্রিকাও মাল্‌রোদের বিরুদ্ধে অভিমত তৈরীতে অগ্রণী হলো। বঁতে-স্রেই যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির এবং খ্মের শিল্পের প্রত্নসম্পদের তালিকা-বহির্ভুত সেটা সুযোগ মত বিস্মৃত হলো সবাই। মাল্‌রোকে তিন বছর এবং শভাস্সোঁকে ১৮ মাসের জেল দেয়া হলো। তাঁর আবিস্কৃত ভাস্কর্য সরকার বাজেয়াপ্ত করলো।

এদিকে ফ্রান্সে ফিরে ক্লারা মাল্‌রোর বাবা ও বন্ধুবান্ধবদের সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লেন। তাঁর ভাইয়েরা কিন্তু শত্রুতামূলক আচরণ করল। তাঁর মায়ের তখন মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। তাঁকে রাখা হয়েছিল প্যারিসের বাইরে একটি স্বাস্থ্য নিবাসে। এক ভাই জোর করে ক্লারাকেও সেখানে ভর্তি করিয়ে দিল। কিন্তু বুদ্ধিমতী ক্লারা পালিয়ে এলেন। তাঁর মার্সেই পৌঁছানোর দু'দিন পর মাল্‌রোর প্রথম সম্পাদক ও চাকুরীদাতা প্রকাশক দইয়েঁ মাল্‌রোর মুক্তির ব্যাপারে সংবাদপত্রে একটি চিঠি ছাপেন। ক্লারা এটি যথাসময়ে পড়েন নি। প্যারিসে এসে তিনি উঠতে বাধ্য হলেন এক বাজে হোটেলে। এর কর্ত্রী তাঁদেরই এক পুরনো দাসী। মাল্‌রোর সাহিত্যিক বন্ধুরা খুব সাহায্য করলেন ক্লারাকে। তবে সবচেয়ে বেশী কার্যকর সহযোগিতা পাওয়া গেল এক অল্পবয়সী ব্যবহারজীবীর কাছ থেকে। তাঁর নাম পোল মনাঁ। ইন্দোচীন যাবার সঙ্গে জাহাজে মাল্‌রো-দম্পতির সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

মাল্‌রোকে মুক্তিদানের জন্যে বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি বেরুলো। অঁদ্রে জিদ, ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক, অঁদ্রে মোরোয়া প্রমুখ ২৩ জন সাহিত্যিকের স্বাক্ষর সম্বলিত এই বিবৃতি। ওদিকে আপীলেও মাল্‌রোকে ১ বছরের এবং

শভাস্সোঁকে ৮ মাসের সাজা দেওয়া হলো। মাল্‌রো ও তাঁর বন্ধু ফ্রান্সের উর্ধ্বতন কোর্টে বিচারের আবেদন জানিয়ে ১লা নভেম্বর দেশের পথে রওনা দিলেন। প্যারিসে পৌঁছেই তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বাবার সঙ্গে অরলেওঁতে ক'দিন কাটালেন। কিন্তু অনেক কাজ প্যারিসে। যাঁরা তাঁর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানানো দরকার। সাইগনের উকিল পোল মনাঁর সঙ্গে পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা হয়েছে, তার ব্যবস্থাদি করতে হবে। তাঁর ইচ্ছা : সাইগনের প্রতিক্রিয়াশীল ফরাশি কাগজ 'অঁ্যাপারসিয়াল' (নিরপেক্ষ) থেকে উন্নত পত্রিকা প্রকাশ করবেন।

দেশে মাত্র সাত সপ্তাহ অবস্থানের পর মাল্‌রো মধ্য-জানুয়ারী ইন্দোচীনের উদ্দেশ্যে রওয়া দিলেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচচার হবার সংকল্প নিয়ে ফিরলেন এশিয়ায়। এবার এলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। সিঙ্গাপুর, ব্যাংককে ক'দিন কাটিয়ে পৌঁছুলেন সাইগন।

সাইগন থেকে একটি কাগজ বের করা তখন চাট্টি খানি কথা নয়। নানা বাধা বিপত্তি। তবু 'ইন্দোচীন' নাম নিয়ে তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রটি বেরুলো। বেশ সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন কাগজরূপেই আত্মপ্রকাশ করলো পত্রিকাটি। তারিখটি স্মরণযোগ্য : ১৭ই জুন ১৯২৫। প্রথমে বেরুলো ৫ হাজার কপি, তিনদিন বিনামূল্যে বিতরিত হলো।

'ইন্দোচীন' পত্রিকায় তিনি এক আশ্চর্যকাহিনী লিখলেন, 'ইস্পাহান অভিযান' নাম দিয়ে। তখনও ইরাণ ভ্রমণ করেননি মাল্‌রো। কিন্তু ফ্লুবেরএর ষ্টাইলে রচিত এই কাহিনীতে তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেন যথেষ্ট। কাহিনীটিতে ইস্পাহানকে তিনি কখনো দিনের আলোয় তুলে ধরেননি। রাতের অন্ধকারে কল্পিত শহরে সংঘটিত নারকীয় ঘটনা এক তীব্র ব্যঞ্জনায় উপস্থিত।

এদিকে তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। মাল্‌রো ও মনাঁকে শারীরিক নির্যাতনের ভয়ও দেখানো হলো। প্রেসের মালিককে পুলিশের পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হলো। ১৪ই আগষ্ট তারিখের পত্রিকায় মাল্‌রো দূরপ্রাচ্যের প্রতিভাবান তরুণদের উচচশিক্ষার জন্যে ফ্রান্সে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর এক জোরালো প্রবন্ধ লিখলেন। শাসিত ও শোষিত মানবতার প্রতি তাঁর সহানুভূতি সুস্পষ্ট। এদিকে নতুন বিপদ। অকস্মাৎ দেখা গেল, ঐ তারিখের পর সাইগনের কোনো ছাপাখানা তাঁদের কাগজ

মুদ্রণে রাজী হচ্ছে না। মনাঁ ও মাল্‌রো ঠিক করলেন টাইপ কিনে নিজে-রাই ছাপবেন। কিন্তু কেউ তাঁদের কাছে টাইপ বিক্রি করলো না। ক্লারাকে নিয়ে মাল্‌রো গেলেন হংকং। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনই কাগজে একটি বিজ্ঞাপন বেরুলো যে এক পাদ্রী প্রতিষ্ঠান টাইপ বিক্রি করবে। মাল্‌রো কিনে নিলেন সে টাইপ। আপাতত কিছু টাইপ ওরা দিলো। বাকীটা পরে পাঠিয়ে দেবে। মাল্‌রো সাইগনে এসে পেঁছুলে টাইপগুলো বাজেয়াপ্ত করলো কর্তৃপক্ষ। প্রথামাফিক সেগুলো নিলাম হবার কথা। তাও হলো না। শারীরিক-মানসিক দু'দিক থেকে তিনি বিধ্বস্ত। কিন্তু ধৈর্য ও সাহস নিয়ে এগিয়ে এলেন আবার। ২৬শে অক্টোবর পাদ্রীদের প্রেরিত টাইপ-গুলো এসে পৌঁছুলো। আবার পুলিশ চেষ্টা করলো ওগুলো বাজেয়াপ্ত করাতে। ফোনে নির্দেশ দিলো শুল্ক বিভাগকে। কিন্তু শুল্ক বিভাগ সে নির্দেশ মানলো না। মাল্‌রো ও মনাঁ তাঁদের টাইপ নিয়ে 'ল্যাঁ দোশিন্ অঁশেঈনে' (শৃংখলিত ইন্দোচীন) নামে নতুন পত্রিকা বের করলেন। আগের চেয়ে ছোট এবং অর্ধ-সাপ্তাহিক। পত্রিকাটিকে কিছুতেই নিখুঁত করা গেল না। বিশেষ করে টাইপের ঘাটতি মর্মান্তিকভাবে দেখা দিলো। একবার এক ভিয়েৎনামী তরুণ রুমালে বেঁধে কিছু টাইপ নিয়ে এসে মাল্‌রোর টেবিলে রেখে গেলেন। দাম নিতে রাজী হলেন না। ৪ঠা নভেম্বর থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল পত্রিকাটি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর হয়ে। ঠিক এসময়ে এলেন মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী, এক সমাজবাদী গভর্ণর। মাল্‌রো ও মনাঁ এতে উৎসাহিত হলেন। বিপ্লবী কু-মিন-তাঙের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ঘটলো। মাল্‌রো তরুণ ভিয়েৎনামীদের নিয়ে 'জ্যন আন্নাম' নামে একটি ছোট্ট দল তৈরী করলেন। পত্রিকা ও দল-কোনোটিই তেমন কোন প্রভাব রেখে যেতে পারেনি যেমন পেরেছে এসব কর্মপ্রয়াসের অভিজ্ঞতার পরোক্ষরূপ নিয়ে প্রকাশিত মাল্‌রোর দুটি উপন্যাস।

ইতোমধ্যে মাল্‌রোর বোধোদয় হলো এই ব্যাপারে। ছোট্ট একটা কাগজ বের করে সীমাবদ্ধ উপায়ে প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি যে খুব বড় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন না তা' তিনি বুঝলেন। অবশ্য মানুষই তার নিয়তির নিয়ামক, ইতিহাসের গতিপথের নিয়ন্তা—এই তাঁর বিশ্বাস। ১৯২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সংখ্যায় পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে উপনিবেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি ভাবলেন ফ্রান্সের

ঔদার্যকে যারা কলংকিত করছে তাদের শায়েস্তা করতে হলে প্রয়োজন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের। অত্যন্ত কাহিল অবস্থায় তিনি ফিরে এলেন ফ্রান্সে। এবার ফিরলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। পত্রিকা তো গেল, ইন্দোচীন নিয়েও বহু-দিন খুব উচ্চ্যবাচ্য করেননি মাল্‌রো। কেবল কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভূমিকায় তাঁর কিছু মন্তব্য প্রকাশিত। একবার তিনি স্পষ্ট বললেন যে, 'ইন্দোচীনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, একজন ভিয়েৎনামীর বিপ্লবী হওয়া, ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফরাশিদের তাড়ানোর প্রক্রিয়া তাঁদের হাতে, তাঁদের দেশ থেকেই শুরু হতে হবে।' সেকালে এর চেয়ে শক্ত এধরনের উক্তি কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে এগুলোই হচ্ছে মাল্‌রোর বক্তব্য ও প্রত্যয় যা তাঁকে মাল্‌রো বানিয়েছে।

ইন্দোচীনে থাকতেই তিনি লিখেছিলেন এক প্রবন্ধ : 'লা তঁতাগিয়োঁ দ্য ল'ক্‌সিদঁ (প্রতীচ্যের লোভ, ১৯২৬)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই সংস্কৃতির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় যে কতো অন্তরঙ্গ তা' বোঝা যায়। প্রবন্ধটিতে বিপরীত দিগন্তের দুই জ্ঞানী পুরুষের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি বর্ত-মান শতাব্দীর মানুষের অনিষ্ট এবং তার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। 'ইন্দোচীন' পত্রিকায় তিনি প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিল্‌ভ্যাঁ লেভী এবং জাপানে নিযুক্ত ফরাশি রাষ্ট্রদূত যিনি তাঁর ভাষায়, 'আমাদের কালের অনন্য কবি—যথার্থ বড় এবং অপরাজেয়' সেই পোল ক্লোদেল-এর সাক্ষাৎকার ছেপেছিলেন। এই দুই মনীষী যেভাবে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন এবং এশিয়ার সভ্যতা ও মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন তা সে যুগে অনেকটা দণ্ডনীয় অপরাধ ছিলো। কিন্তু তাঁদের মতো সৎসাহস নিয়ে মাল্‌রো এগিয়ে আসছিলেন। বিশ্বের সংস্কৃতিসমূহের মিলনই তো বুদ্ধিজীবীর কাম্য। তবে সে কালের পরিপ্রেক্ষিত ছিলো ভিন্নতর। তাই পরে এশিয়ার ওপর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো লেখা হয়ে গেলে তিনি একবার বলে-ছিলেন 'পৃথিবীটা আমার বইয়ের রূপধারণ করছে ক্রমশ।' এটা হয়তো সর্বৈব সত্য নয়। তবে এটা সত্য যে তাঁর স্বপ্নের এশিয়া—বাস্তব এশিয়ার মতো প্রতীয়মান হতে বেশী দেরী করলো না। (তু. জঁ লাকুতুর, মাল্‌রো জীবনী, ১৯৭৩, পৃঃ ১১৫)। বস্তুত, এশীয় অভিজ্ঞতা মাল্‌রোকে দিয়েছে সৌভ্রাতৃত্বের, ঐতিহ্য প্রীতির ও বিপ্লবী চেতনার দীক্ষা।

দ্বিতীয়বার দূরপ্রাচ্য গমনের সময় ফ্রঁসোয়া মোরিয়াকের প্ররোচনায় প্রকাশক বের্নার গ্রাস্সে মাল্‌রোকে তিন হাজার ফ্রঁ দাদন দিয়েছিলেন তিনটি বই লেখার জন্যে। এর প্রথম বই, 'প্রতীচির লোভ'। মাল্‌রো এই গ্রন্থে এক-জন চীনা ও একজন পশ্চিমা তরুণ চিন্তকের পত্রালাপের মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যাবলী তুলে ধরেছেন। কাঁচা-পাকা চিন্তার পরিচয় সমগ্র গ্রন্থে ছড়ানো। তবু সেকালে এটি একটি প্রাথমিক প্রয়াস এবং সফল সৃষ্টি। একই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি 'প্রসঙ্গঃ ইউরোপীয় যুব সমাজ' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন('এক্রি,' একই প্রকাশক, ১৯২৭)।

এভাবে ১৯২৬ সালের মধ্যেই অঁদ্রে মাল্‌রো ফ্রাঁন্সে একজন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন। সমালোচক মোরিস শখ্‌স্ লিখেছেন: 'এসময় যাঁদের কথা লোকে আলোচনা করতো মাল্‌রো তাঁদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে পেলাম এক জলজ্যন্ত মানুষের ছোঁয়া। তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে এডভেঞ্চার, বিষাদ এবং অদম্য মনোবল। মানুষটা নিজেই যেন ইতালীয় রনেসঁস্ ব্যক্তিত্বের সুন্দর প্রতিকৃতি। তবে আগাগোড়া ফরাশি কেতাদুরস্ত। খুব দ্রুত কথা বলেন, খুব ভালো বলেন। একটু সবজান্তা ভাব। নিশ্চিতভাবে দীপ্তিমান। সাক্ষাতেই আপনার মনে হবে যে শতাব্দীর সবচে' বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত।'

মাল্‌রো তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতেই ছোট বড়, খ্যাত-অখ্যাত প্যারিসীয় শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পরিচয়, প্রশংসা ও ঈর্ষা কুড়াতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন। ইন্দোচীনের এডভেঞ্চার তাঁর জীবনের এই পর্যায়কে আরো তীক্ষ্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। যদিও এখনো এমন কিছু লেখেননি যা' তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে, তবু ভালেরী, জিদ্, মোরিয়াক প্রমুখ বড় মাপের লেখকদের প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। এশিয়া থেকে ফেরার পর সাহিত্যিক মহলে তাঁর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ইভঁ গল-ক্লের গল দম্পতি (বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে পরিচিত), অঁদ্রে শঁসো (ফরাশি একাডেমীর সদস্য) ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। আশ্চর্যের বিষয়, অঁদ্রে ব্রতোঁ আরাগোঁ, এলুয়ার, ররের দেসনোস প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক যাঁরা তখন স্যুর্-রেয়ালিস্ত আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং পরে মার্কসবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন মাল্‌রো। অথচ ইন্দোচীনে বিপদের দিনে এঁরা তাঁকে সাহায্যের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া তাঁর লেখায়ও ছিলো স্যুররেয়ালিস্মের আদিরূপ।

এই সময়ে (১৯২৬-২৭) তাঁর খেয়াল হলো বইয়ের দোকান দেবেন। কম সংখ্যক কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট বই প্রকাশ করে পয়সা কামাবেন। পুরনো বন্ধু শভাস্সোঁকে নিয়ে এই নতুন কর্মোদ্যোগে নেমে পড়লেন। অল্পদিনেই দুটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। কিন্তু কোনোটাই খুব প্রতিষ্ঠা পেল না। অবশেষে বিখ্যাত প্রকাশক গালিমারে প্রথমে 'পাঠক' এবং পরে 'শিল্প-নির্দেশক' রূপে কর্মরত থাকেন।

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালানোর সময় একজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। নাম আলেকসঁদ্র আলেকসিয়েফ। আগে নাবিক ছিলেন। হংকং-এ গেছেন। চীনা অভিজ্ঞতা দু'জনকে কাছে টানল। পরবর্তীকালে এই শিল্পী মানুষ মাল্‌রো সম্পর্কে অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন উদার বন্ধু ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে। মাল্‌রোও তাঁকে তিরিশ বছর পর নিজের 'রচনা সমগ্র' অলংকরণের দায়িত্ব দিয়েছেন।

লেখালেখি ও প্রকাশনার নানা কাজের ফাঁকে বেরুলো 'লে কোঁকের', (বিজয়ী) উপন্যাস। প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো 'নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ'—এ। ঔপনিবেশিক ইন্দোচীন, চীনের সাধারণ ধর্মঘট, রুশ কমি-শনার বোরোদিন, বিপ্লবী হং, সাংবাদিক গারিন, তথা দূর-প্রাচ্যের জটিল ও সংগ্রামী জীবনধারার একটি বিপুল ছবি যেন প্রথম তুলে ধরা হলো পাশ্চাত্যের কাছে। তাছাড়া, মৃত্যু নিয়ে লেখকের নানা মন্তব্য পাঠকদের মনে নতুন বোধের জন্ম দিলো।

প্রকাশকালের দু'বছর পর ট্রটস্কি পড়েছিলেন উপন্যাসটি। তিনি মাল্‌রোর ষ্টাইল ও সাহসের তারিফ করেছেন। চীনা বিপ্লবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি যে বিতর্কের উর্ধ্বে তাও স্বীকার করেছেন। তবে মাল্‌রোর কল্পিত ভুবনে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও নান্দনিক চৈতন্যের আধিক্য তাঁর অপছন্দ। তাঁর মতে, লেখকের সঙ্গে বিষয়ের, বিশেষ করে এই গ্রন্থের নায়িকা—স্বয়ং বিপ্লবের, স্বাভাবিক সম্পর্কের অভাব রয়েছে। ট্রটস্কির সমালোচনার জবাবে মাল্‌রো লিখেছেন, মার্কসবাদী প্রচারপত্র লিখতে বসেননি তিনি। বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিকও তাই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, বিপ্লবের সৃজন-হননও নয়। এরপর ট্রটস্কি একটি প্রত্যুত্তর লিখেছিলেন। 'বিজয়ী'র লেখকের সঙ্গে রুশ বিপ্লবের হতভাগ্য নায়কের সাক্ষাৎ হয়েছিল এই বিতর্কের কিছু পর, ট্রটস্কির প্যারিস প্রবাসকালে।

দোষেগুণে 'বিজয়ী' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশ শতকের অন্যতম ক্লাসিক্‌সরূপে গণ্য হয়েছে। শতাব্দী-সূচনায় যে বিপ্লবী চেতনা দেশ-বিদেশে দেখা দিয়েছে, এই উপন্যাসে সেই চেতনাকে ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রখরতর করতে প্রয়াস পেয়েছেন মাল্‌রো।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে এক বিচিত্র বই বেরুলো তাঁর, গালিমার-এর প্রকাশনালয় থেকে। বইটির নাম 'রোয়াইয়োম্ ফার্ফল্যু' (কল্প-সাম্রাজ্যের কাহিনী)। লক্ষ্যযোগ্য যে, বর্তমানকালে এই 'ফার্ফল্যু' শব্দটিও মাল্‌রোর আবিষ্কার। এর প্রথম ব্যবহার করেন রাবলে ষোড়শ শতকে। মাল্‌রো কর্তৃক প্রচলিত হবার পর থেকে শুরু হয় শব্দটির এন্তার ব্যবহার। 'কল্পজগত,' 'কাল্পনিক চিন্তা' ইত্যাদি থেকে এতে 'সহানুভূতিশীল, তবে একটু মাথা খারাপ' (যেমন 'বাউল') 'বর্ণাঢ্য চরিত্র—যা খুশি তা-ই করে', প্রভৃতি বোঝায়। (দ্রঃ 'দিকসিওনের দে মো নুভো', প্যারিস, হাস্সেৎ/চু, ১৯৭১, পৃঃ ২০১)।

মাল্‌রোর মার্কিন জীবনীকার রবার্ট পেইন বইটিকে কোল্‌রিজের 'কুবলা খান'—এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে, এই আবহ সৃষ্টি করে মাল্‌রো এক গভীরতর মৃত্যু-ভাবনার সূচনা করলেন।

এরপর এলো তাঁর অন্যতম ছোট্ট উপন্যাস, 'লা ভোয়া রোয়াইয়াল', (রাজকীয় সড়ক, বের্নার গ্রাস্সে, অক্টোবর ১৯৩০)। 'বিজয়ী' উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছিল একটি গণ-অভ্যুত্থানের কাহিনী, এই গ্রন্থ পের্কেন এবং ভাল্লেক নামক দুই চরিত্র নিয়ে। দু'জনের পরিচয় ইন্দোচীনগামী জাহাজে। নানা-বিষয়ে তাঁদের সংলাপ। আবার মৃত্যু-ভাবনা। ভাল্লেক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ। আধুনিক জীবন তাঁর অপছন্দ। মাল্‌রোর মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্যে কম্বোডিয়ার মূর্তি পাশ্চাত্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে কাজ করবে, এই পরিকল্পনা। পের্কেন ধীর স্থির অভিজ্ঞ। আরেক চরিত্র গ্রাবো—ফাউস্টীয় আদলে কল্পিত। নিজের ইন্দোচীন অভিজ্ঞতার যুগপৎ দার্শনিক ও রোমাঞ্চকর রূপায়ণ।

সম্ভবত কয়েকখণ্ডে উপন্যাসটি লিখবেন ভেবেছিলেন মাল্‌রো। কিন্তু পরে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। এসময় থেকে তাঁর মনে শিল্পচিন্তা প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ শহর-বন্দর ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলো সফর করা শুরু করেছিলেন আগে থেকেই। প্রকাশক গালিমার প্রয়োজনীয় অর্থ যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। সফরের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বাড়তে লাগল।

১৯২৮ থেকে ৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ইরানী শিল্পের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে অব্যাহত রাখলেন অনুসন্ধান। ফার্সী ভাষার চর্চাও করেছিলেন কিছুটা। ১৯২৯ সালে গেলে আফগানিস্তানে। গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পে তাঁর বহুদিনের আগ্রহ। ইতোমধ্যে এই শিল্পের একটি প্রদর্শনী করেন প্যারিসে। প্রদর্শনী তালিকার ভূমিকাটিও তাঁর লেখা। পরবর্তীকালে সুবিস্তৃত শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী রচনার সূত্রপাত এখানেই। নানা দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকাশকের জন্যে তিনি প্রস্তুত করেন 'নাপোলেওঁর জীবনী'। এই বছরের শেষ দিকে (২০শে ডিসেম্বর) তাঁর পিতা প্যারিসে আত্মহত্যা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র চুয়ান্ন বছর। হাসিখুশী সাংসারিক জীবনেও সুখী এই মানুষটির আত্মহত্যা ছিলো রীতিমতো রহস্যময়। অনেকে সন্দেহ করেন যে তাঁর দাদাও সম্ভবত আত্মহত্যা করেছিলেন। পিতার মৃত্যু অঁদ্রেকে ভাবিয়ে তুলল আরো। জীবনের অনিত্যতা কর্মপ্রয়াসের যথার্থ মূল্যায়ন সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন জাগল মনে।

বয়স তাঁর তিরিশ। এবার লেখা শুরু করেন 'লা কোঁদিসিঁও য়্যুমেন' (ইংরেজিতে দুটো অনুবাদ—'ষ্টর্ম ওভার শাংহাই' এবং 'ম্যান্স ফেইট')। এই উপন্যাসের পটভূমিঃ চীনা বিপ্লবের এক জটিল অধ্যায়ঃ শাংহাইয়ের সাম্য-বাদী অভ্যুত্থান এবং চিয়াংকাইশেক কর্তৃক তার নিষ্ঠুর দমন। অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্যঃ ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জীবনের যথার্থরূপের উন্মোচন। আগের বছর মাল্‌রো চীন সফর করে এসেছিলেন। ভ্রমন বৃত্তান্ত, সংবাদপত্রের অংশবিশেষও ব্যবহৃত হয়েছে এই বইতে। প্রধান চরিত্র কিয়ো; অনেকের ধারণা চু-এন-লাইয়ের আদলে গড়া। আবার কেউ কেউ মনে করেন মাল্‌রোর এক জাপানী বন্ধুর নাম ও ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ। এছাড়া জিজর, ফেরাল, ক্লাপিক, চেন—সব চরিত্রই এসেছে পরিচিত মহল থেকে। কিন্তু এদের তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন পাস্কালীয় প্রত্যয়ে অর্থাৎ বাস্তবতার অনুভব সম্ভব সংযোগের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতায়। পাস্কালের কাছে মানব পরিস্থিতি ছিলো মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত আসামীর অবস্থা আর মাল্‌রোর কাছে তা' হলো বাক্যহীন প্রায় অসুস্থ মানুষের বদ্ধ-বিবর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস, কর্মে মৃত্যুজয়ের অভিলাষ।

বিপ্লবী, আততায়ী চেন-এর চরিত্র বোঝা যায়—অনবদ্য প্রকাশ কৌশলেঃ '১৯২৭—২১শে মার্চ। রাত্রি সাড়ে বারোটা। চেন কি মশারিটা তুলে

ফেলবে? না, ওর মধ্যে দিয়েই ছোরা চালিয়ে দেবে? কেউ দেখে ফেলছে না তো তাকে? সামনাসামনি যদি যুদ্ধ হ'ত, সজাগ সতর্ক শত্রু যদি আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিত, কত স্বস্তি বোধ করত সে!

বাইরের কোলাহলের ঢেউ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় অনেকগুলো গাড়ি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

...এই লোকটির মৃত্যু চাই। সে ধরা পড়বে কিনা, খুনের দায়ে শাস্তি পাবে কিনা, সে চিন্তা এখন নয়। এখন শুধু একটি ভাবনা। এক আঘাতে শেষ করে দিতে হবে সামনের লোকটিকে। যেন বাধা দেবার অবকাশ না পায়। বাধা দিতে পারলেই তো চেঁচিয়ে উঠবে।

(মৃত কিয়োর স্ত্রী মে ও তার শ্বশুরের কিছু উক্তি) :

তুমি না বলতে বাবা, এবার জাতির ত্রিশ শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে, সে আর ঘুমোবে না?...

জীবনের সঙ্গে বেশীদিন ছলনা চলে না। বাস্তব সত্য কোথাও নেই; আছে শুধু ভাবের জগৎ। সে জগতে প্রবেশ করলে বোঝা যায় সবই মায়া, সবই অর্থহীন।

জগতে এমন কোন মহিমা নেই যা' বেদনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।'

[উদ্ধৃত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-প্রবাহ, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ২৬—৩১]

বইটি 'নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ'-এ প্রকাশিত হলো ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী থেকে জুন সংখ্যায়। প্রথমে অনেকে পছন্দ করতে পারলেন না বইটি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মাল্‌রোর শুভাকাঙ্খী নবেল পুরস্কারবিজয়ী এবং রবীন্দ্র-অনুবাদক অঁদ্রে জিদ্‌। তবে জিদ্‌ লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি ও জীবনানুষঙ্গের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, অনেক বেশী বস্তু মাত্রাতিরিক্ত জটিলতা-সহ উপস্থাপিত। অবশ্য কিছু সমালোচক উপযুক্ত তারিফ করলেন, এই গ্রন্থের ট্র্যাজিক মহিমা, সূক্ষ্ম এবং নতুন মানবিক চৈতন্যের সমাহার প্রসঙ্গে। প্যারিস থেকে ইলিয়া এরেনবুর্গ 'ইজভেস্তিয়া'য় লিখলেন : 'মাল্‌রোর নতুন উপন্যাসটি যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হচ্ছে। ...কিন্তু বইটি বিপ্লবের ওপর নয়। মহাকাব্যও নয়। এ-এক অন্তরঙ্গ জুর্নাল। লেখকের মনের অনেকগুলো এক্‌সুরে অংশত এক-একটি চরিত্রে প্রতিফলিত। তাঁর গ্রন্থের দুর্বলতা (?) এখানে যে, এর চরিত্রগুলো বেশ বেঁচে বর্তে আছে কিন্তু আমরা

তাদের জন্যে দুঃখবোধ করি, কারণ ওরা কষ্ট পায় বলে আমরাও কষ্ট পাই অথচ এইভাবে জীবন কাটানোর বা দুঃখ পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

১৯৩৩ সালের ১লা ডিসেম্বর 'মানব পরিস্থিতি' ফরাশিদেশের সেরা সাহিত্য পুরস্কার 'গোঁকুর' পেল। বিচারকবর্গের সিদ্ধান্ত ছিলো সর্বসম্মত। তবে ঘোষণায় তাঁরা মাল্‌রোর অন্য দুটি 'এশীয়' উপন্যাসকেও এই সম্মানের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এতে সুবিধা হলো মাল্‌রোর। বই তিনটির বিক্রি বাড়লো এবং মাল্‌রো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন অবশেষে। এখানে উল্লেখ্য যে, গোঁকুর পুরস্কার মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রঁ কিন্তু এর সম্মান ও স্বাভাবিক বিক্রি হিসাবের বাইরে।

'মানব পরিস্থিতি' প্রচুর সুখ্যাতি পেয়েছে দেশে-বিদেশে। একজন ফরাশি সমালোচক সুন্দর বলেছিলেন, 'মাল্‌রো ফরাশি সাহিত্যে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন। এতকাল এই সাহিত্যে বিশ্লেষণ ও কর্মপন্থা (এ্যাকশান) দুই মেরুতে অবস্থান করে ভারসাম্য বজায় রাখত। মাল্‌রো এই ভ্রম সংশোধন করে দেখালেন যে যথার্থ এ্যাকশান বেছে নিয়ে তার শেষ অবধি পৌঁছুলে তাতেই ঘটে নৈতিক সত্যের চূড়ান্ত প্রকাশ।'

এই বছরই ক্লারার গর্ভে মাল্‌রোর প্রথম সন্তান একমাত্র কন্যা ফ্লোরঁস্‌ -এর জন্ম। পরে ফ্লোরঁস্‌ বিয়ে করে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আল্যাঁ রেসনে-কে। রেসনে ষাটের দশকের শুরুতে 'লান্নে দেরনিয়ের আ মারিয়েনবাদ' (মারিয়ান বাদে গত বছর) শীর্ষক ছবি করে সুনাম অর্জন করেন। এদিকে পিতার আদুরে কন্যা হলেও ফ্লোরঁস সাংবাদিকরূপে একই সময়ে অর্থাৎ তাঁর পিতার মন্ত্রীর পদে আসীন থাকাকালে 'রাষ্ট্রবিরোধী' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করে'।

ইউরোপের আবহাওয়ায় তখন সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে অন্তহীন বিতর্ক। প্রকাশক গালিমারের সংস্থায় মাল্‌রোর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন গ্রুৎঅইয়েন যাঁকে বলতে গেলে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন তিনি। এককালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক 'গ্রুৎ' ছিলেন মাক্স ওয়েবার-এর অনুগামী। বিশ্বাসে মার্কসবাদী কিন্তু মাল্‌রো তাঁর কাছ থেকে লাভ করেন হেগেল, একার্ট ও নীটশের দর্শন বিষয়ে গভীর জ্ঞান। ডাচ পিতা, রুশ মাতা এবং নিজে ফরাশি-প্রেমিক গ্রুৎ ছিলেন এক মহাপণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী। মাল্‌রোর রচনায় অবশ্য পাস্কাল, নীটশের অনুসৃত আত্মস্বাতন্ত্র্য-

বাদের প্রভাবই বেশী অনুভূত হবে পাঠকের। দস্তয়েভস্কির অন্তর্মুখীনতাও যে তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিল কিছুকাল, তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রুৎ-এর স্নেহদৃষ্টির প্রশ্রয় ও প্রশংসা মাল্‌রোকে উৎসাহিত করেছে, এতে সন্দেহের কারণ নেই। উল্লেখ্য যে, অনেকের ধারণা – 'মানব পরিস্থিতি'র জিজর চরিত্র গ্রুৎ ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ। কিন্তু মাল্‌রো তা অস্বীকার করেছেন। তবে মাল্‌রোর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে কিংবা ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে সোভিয়েত-সমর্থক কার্যকলাপে যে গ্রুৎ-এর প্রভাব রয়েছে তা' সহজেই অনুমেয়।

মার্চ, ১৯৩৪। মাল্‌রো আরেক এডভেঞ্চার সমাপ্ত করলেন এবার। সংক্ষিপ্ত ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন এই অভিযান। তবু একটি জীবনধারার বিকাশে বিশেষ করে, লেখক অঁদ্রে মাল্‌রোর সাহসিকতার পরিচয় নিতে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই। প্রথমে ফরাশি সংবাদপত্রে, পরে বিশ্বের বড় বড় সব খবরের কাগজে বেরুলো এক অত্যাশ্চর্য সংবাদ : উড়োজাহাজে একজন বৈমানিক ও একজন যন্ত্রকুশলীকে সঙ্গে নিয়ে মাল্‌রো দুর্গম ও কান্তার মরু পাড়ি দিয়ে রাণী সাবার রাজধানী আবিষ্কার করেছেন। অকস্মাৎ নতুন প্রাসঙ্গিকতায় উদ্ভাসিত হলো এক বাইবেলী পুরাণ কাহিনী। সচরাচর যা' ঘটে থাকে, শুরু হলো আবার মাল্‌রো প্রসঙ্গে নয়া বিতর্ক।

র‍্যাঁবো যেমন গিয়েছিলেন আবিসিনিয়ায়, টি. ই. লরেন্স দিন কাটিয়েছিলেন মরুভূমির মায়ায়—তেমনি ঘটেছে মাল্‌রোর এই নতুন নতুন এডভেঞ্চার। সম্প্রতি অর্থকষ্ট ঘুচেছে তাঁর। তাছাড়া, একটি সংবাদপত্র বেশীর ভাগ খরচ বহন করতে রাজী। মাল্‌রো রাণী সাবার বিস্মৃত রাজধানী প্রদক্ষিণের ব্যবস্থাপনা সারলেন নামকরা বৈমানিক কর্নিগ্‌লিয়োঁ-মলিনিয়ের সঙ্গে। ভূগোল সমিতির গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে শুরু করলেন অনুসন্ধান। জানলেন, ১৮৪৩ সালে জোসেফ আর্নো নামে এক ফরাশি ইয়েমেন আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথম খোঁজ দেন সলোমনের প্রণয়িনী বিলকিস বা রাণী সাবার রাজধানীর। এক মজার মানুষ ছিলেন এই আর্নো—প্রোভঁসের ঔষধ বিক্রেতা এবং আরবী-বিশেষজ্ঞ। কয়েকটি মোমবাতি আর একটি গাধা মাত্র সম্বল করে পাড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ আরবের মরুভূমি। এবং এই উপকথার উদ্দিষ্ট মারেব এলাকা দেখে ছিলেন অন্ধ হয়ে যাবার আগে। মাল্‌রো ঠিক করলেন তিনিও যাবেন সে পথে। জীবিত না ফেরার ঝুঁকি যথেষ্ট, তবুও যাবেন।

বিনা ভাড়ায় পাওয়া গেল এক বিমান। ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রওনা দিলেন কায়রোর উদ্দেশ্যে। পরবর্তী ধাপ জিবুতি। ৭ই মার্চ জিবুতি থেকে আবার ওড়া। এডেন থেকে উড়তে পারলে সুবিধা হতো কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিললো না।

বৈমানিকের পোশাক তিন অভিযাত্রীর। তবে সঙ্গে রয়েছে আরবী জোব্বাও। বলা যায় না, বাধ্যতামূলক অবতরণের ফলে যদি লরেন্স অব এ্যারাবিয়ার মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়? কিন্তু তা' হয়নি। অনেক চক্কর দিয়ে শেষ অবধি দেখতে পেলেন এক বালির স্তূপ কিংবা ভগ্ন প্রাসাদ। 'এঁ্যাত্রাসিজঁ্য' পত্রিকার ৯ই মে (১৯৩৪) সংখ্যায় তিনি বর্ণনা দেন এই অভিযানের। সে বর্ণনায় রাণী সাবা প্রসঙ্গে কোরআনের একটি উদ্ধৃতিও দিয়েছেন: 'আমি সেখানে দেখেছি একটি রমণীকে, চমৎকার সিংহাসনে বসে পুরুষদের শাসন করে চলেছে। সে এবং তার প্রজারা পূজা করে সূর্যকে।' রাণী সাবার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া একটি মিশরীয় মন্দিরের মতো দালান এবং একটি ভাঙা দেয়ালও তিনি দেখতে পান বলে উল্লেখ করেছেন। পত্রিকাটিতে মোট সাতটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।

মাল্‌রো ও তাঁর বৈমানিক বন্ধুর 'আবিষ্কার' নিয়ে শুরু হয় প্রচুর বাদানুবাদ। অনিবার্য কারণে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের উপায় নেই। তবে শতাব্দীর কিংবদন্তীর অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত ঘটনা বৈ কি। 'একজন প্রতিষ্ঠিত ফরাশি লেখক আর কাজ পেলেন না মরুভূমির দেশে গিয়েছেন হাওয়াই এডভেঞ্চারে।' যাহোক, ফিরতি-পথে ইথিওপিয়ার রাজার দরবারে যান মাল্‌রো। রাজা সলোমনের বংশধরের দাবী তাঁর পূর্বপুরুষদের।

এই অভিযানে আর কিছু না হোক বিমান ও যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন মাল্‌রো। এই অভিজ্ঞতা কেবল প্রত্যক্ষ নয়, একান্ত নিবিড়। জীবনের মোড় ফেরার বাঁকে তা' বেশ কাজে এসেছিল। এক-এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনই তো মাল্‌রো জীবনকে করেছে সমৃদ্ধতম।

ইতোমধ্যে ইউরোপের ইতিহাসে নেমে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা। হিটলার এসেছেন জর্মনীর ক্ষমতাশীর্ষে (জানুয়ারী, ১৯৩৩)। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তখন অবধি মাল্‌রোকে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী রূপে তেমন দেখা যায়নি। ইন্দোচীনে প্রতিশ্রুত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকায়, কেন জানি,

ফিরে আসেন নি। গ্রুৎ, রমঁ্যা রলঁ, এরেনবুর্গ প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও তাঁকে খুব 'সংগ্রামী' করে তুলতে পারেনি। 'একাকিত্বের ট্র্যাজিক বেদনা মূর্ত করাই তাঁর শিল্পীজীবনের লক্ষ্য'—এ ধরনের ঘোষণা ও তিনি কখনো সখনো করে থাকবেন। অবশ্য দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উদাহরণও মিলবে এর বিপরীতে। রুশ ছবি 'ব্যাটল শীপ পটেমকিন' ফ্রান্সে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে (১৯২৭) কিংবা গায়াকোভস্কির স্মৃতির প্রতি অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তিনিই প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এসেছেন সবার আগে। এদিকে ট্রটস্কি আর এরেনবুর্গ তো লিখেই খালাস : বুর্জোয়া খোলস ছেড়ে মাল্‌রো বিপ্লবের পথ মাড়াবেন না কখনো। কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্গেই হাত মেলালেন মাল্‌রো। ২১শে মার্চ, ১৯৩৩ সালে সংঘটিত হলো 'বিপ্লবী লেখক শিল্পী সমিতি'। মাল্‌রো তার অন্যতম নেতা। এরেনবুর্গ তখনো সন্দিগ্ধ। (দ্রঃ স্মৃতিকথা : ১৯২১-৪৬; পৃঃ ১৩৬)।

ফ্যাসীবাদের মুখোমুখি ইউরোপ-রাশিয়ার 'অঁতঁত্ কার্দিয়াল' তথা সম্প্রীতির সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে মাল্‌রোর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হলেন না তিনি। আপন বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে নির্ভর করে দীর্ঘ কাল তাদের সহগামী ছিলেন সংগ্রামের পথে। এসময়ে একটি প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট বললেনঃ '...ব্যক্তিগত ভাবে ইন্দোচীনবাসের অভিজ্ঞতাসূত্রে আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, একজন সাহসী আন্নামিতের (অর্থাৎ ভিয়েৎমিনের) বিপ্লবী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।' (মারিয়ান, ১১ অক্টোবর, ১৯৩৩)।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি বড় বড় শব্দের যে প্রহসন উপনিবেশের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত মাল্‌রোর প্রবন্ধরাজি তার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করল। ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লেখক সম্মেলন। মাল্‌রো নিমন্ত্রিত। ট্রটস্কি, এরেনবুর্গের সীমিত প্রশংসা সত্ত্বেও তাঁর 'মানব পরিস্থিতি' আলোড়ন সৃষ্টি করেছে রুশ পাঠক মহলে। মস্কোতে বইটিকে নাট্যরূপ দেবার ও চিত্রায়িত করবার কথা ভাবছেন মেয়েরহোল্ড এবং আইজেনষ্টাইনের মতো এই দুই মাধ্যমের কুশলী পরিচালক। এদিকে মাল্‌রো ভাবছেন, বাকু সফর করে পেট্রলের ওপর একটি উপন্যাস লিখবেন। কয়েকবছর আগে চীনে যাবার পথে ক্লারাসহ একবার বাকুতে ছিলেন অল্প সময়। যাহোক, মস্কোর সম্মেলন চলল দু'সপ্তাহ ধরে। আপাতদৃষ্টিতে খুবই উন্মুক্ত সম্মেলন—প্রকাশ্য ঘোষণা : সাম্যবাদী ও বুর্জোয়াদের সংলাপ সংকট উত্তরণে একান্তভাবে কাম্য।

আসলে চলছিলো জটিল সংশ্লেষণ এবং দলে টানার প্রত্যাশিত প্রয়াস। কিন্তু মাল্‌রো তাঁর স্বভাব সিদ্ধ দার্শনিক ভঙ্গীতে এক সাহসী বক্তৃতা করলেন। মূল বক্তব্য : রুশ ব্যবস্থায় প্রতিভার সংকোচন অবশ্যম্ভাবী। এক রুশ সমালোচকের প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'রাজনীতিকে যদি আমি সাহিত্যের নীচে স্থান দিতাম তাহলে অঁদ্রে জিদের সঙ্গে কমরেড দিমিত্রভের পক্ষাবলম্বন করে ফ্রান্সে আন্দোলন করতাম না, কমিনটার্নের পক্ষে তাঁর মুক্তি দাবী করে বার্লিনে যেতাম না, এবং এখানে উপস্থিত হতাম না।' হাততালি পড়লো যথেষ্ট। তবু শেষরক্ষা হলো না। 'প্রাভদা'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 'সমাজবাদী বাস্তবতা' সম্পর্কে তাঁর নির্লিপ্ত সংজ্ঞা স্তালিনপন্থীদের খুশি করতে পারে নি। ম্যাক্সিম গর্কি অবশ্য প্রচুর সমাদর করলেন মাল্‌রোকে। অনেক আলোচনা হলো দু'জনে। তাছাড়া 'মা'র লেখক 'মানবপরিস্থিতির' লেখককে একরাত রাখলেন তাঁর 'দাচা'য় (বাগানবাড়ী)। আইজেনষ্টাইনের ব্যক্তিত্বেও মুগ্ধ হয়েছেন মাল্‌রো। প্রথমে 'অক্টোবর' পরিচালক দোজেংকো মাল্‌রোর 'মানব পরিস্থিতি' চিত্রায়িত করতে চাইলেও মাল্‌রোর পছন্দ আইজেনষ্টাইনকে। মেয়েরহোল্ড ও বইটির নাট্যরূপ দেবেন ঠিক হলো। কিন্তু অল্পকাল পরেই সবাই সেকথা ভুলে গেল। অথবা বাধ্য হলো ভুলতে।

মস্কো থেকে ফিরে দু'মাস পরে মাল্‌রো নিজেই একটি সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করলেন প্যারিসে। এতে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানালেন তিনি সবাই বুঝলো, আদিষ্ট বা নির্দেশিত হয়ে লিখবেন এমন লেখক মাল্‌রো নন। বিবেকের আহ্বানে এরপর কাজ করে গেলেন ফ্যাসিষ্টদের হাতে নির্যাতিত জর্মন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের পুনর্বাসনের জন্যে। এ কাজের ফলশ্রুতিতে বেরুলোঃ 'ল্য তঁ দ্যু মেপ্রি' (হিংস্য, গালিমার, ১৯৪৪)। পরে বইটির নাট্যরূপ দান করে আল্‌জেরিয়ায় অভিনয় করিয়েছিলেন আল্‌বের কাম্যু। অনেকের ধারণা, এই বইয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মাল্‌রোকে পাওয়া যায় না; তাঁর পরিপক্ক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার চিহ্নও এতে কম। অনেকদিন পর এক সাক্ষাৎকারে বইটিকে 'মূল্যহীন' বলেছেন মাল্‌রো। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা একে মাথায় তুলে নিলেন এক 'দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সময়োপযোগী সাহিত্য' বলে। জনৈক রুশ সমালোচক তো লিখেই বসলেন যে, অঁদ্রে মাল্‌রো অবশেষে সাম্যবাদের মধ্যেই তাঁর সত্য

খুঁজে পেয়েছেন।[১] প্রকৃতপক্ষে, তা যথার্থ নয়। তবে এই গ্রন্থের বেশ কিছু অংশে উচ্চারিত হয়েছে মাল্‌রোর জীবনবাণী :

'মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া শক্ত ব্যাপার। মিলের দিকে জোর দিয়ে বের করা যতো শক্ত তার চেয়েও বেশী কঠিন হলো বিরোধের ওপর জোর দিয়ে পরিচয় খোঁজা। পয়লা পদ্ধতিতে পার্থক্য যতো শক্তভাবে লালিত হয় দ্বিতীয়টিতেও তার চেয়ে কম নয়। তবে এই শেষোক্ত পথেই দেখা যায় মানুষ মানুষই এবং সে কারণেই সে নিজেকে অতিক্রম করে, সৃষ্টিশীল হয়, আবিষ্কর্তা বনে বা আপন স্বরূপ নির্ণয় করে।'

এভাবে তাঁর মধ্যে জন্ম নিলো এক নতুন মানসিকতা যাকে তিনি বলেছেন, 'লা ফ্রাতেরনিতে ভিরিল্'। আমরা বাংলায় বলবো: পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্ব।

মাল্‌রো-আহুত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ম্যাক্সিম গর্কি এক তারবার্তায় 'ফ্যাসিজমের আবির্ভাব যাঁদের জন্যে ব্যক্তিগত আঘাতের শামিল' তাঁদের এই উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন। সম্মেলনে অন্য যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁরা হলেন অঁদ্রে জিদ্, লুই আরাগোঁ ও ইলিয়া এরেনবুর্গ। জিদ্ ও মাল্‌রো সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে বিশেষ অনুরোধ জানান, গর্কি যখন এলেন না, পাস্তেরনাক এবং বাবেলকে যেন অবিলম্বে পাঠানো হয়। স্তালিনের বিশেষ নির্দেশে পাস্তেরনাক সম্মেলনে যোগ দিতে সমর্থ হন। পরে মাল্‌রো তাঁর এক জীবনীকারের কাছে ঘটনাটি রসিয়ে বর্ণনা করেন: ইহুদী পুরোহিতের মতো পোশাক পড়ে উপস্থিত হন পাস্তেরনাক। তিনি খুব সুন্দর একটি কবিতা পাঠ করেন। আমি তার ফরাশি তর্জমা শোনাই। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিলো সোভিয়েত সংস্কৃতি সম্পর্কে বলার। আর পাস্তেরনাক বলেন..."রাজনীতির কথা? বেফজুল! কোনো কাজের না! রাজনীতি? বরং গ্রামে যান, বন্ধুরা আমার, গ্রামে গিয়ে মাঠে মাঠে ফুল তুলুন...।" এরপর আবার মাল্‌রোর মন্তব্য : 'এই তো স্তালিনের প্রতিনিধি!'

এখানে উল্লেখ্য যে, মাল্‌রোদের আমন্ত্রিত রুশ সাহিত্যিক বাবেলকে আসতে দেয়া হয়নি। পাঁচ বছর পর তাঁকে গুলি করে মারা হয়। (জঁ লাকুতুর, মাল্‌রো জীবনী, পৃ. ১৮২)।

১৯৩৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ফ্যাসিষ্ট ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করলো। আবার শোনা গেল মাল্‌রোর বজ্রকণ্ঠ।

পোল্ ভালেরির সঙ্গে, ১৯৩৯

আলজাসে যুদ্ধরত, ১৯৪৫

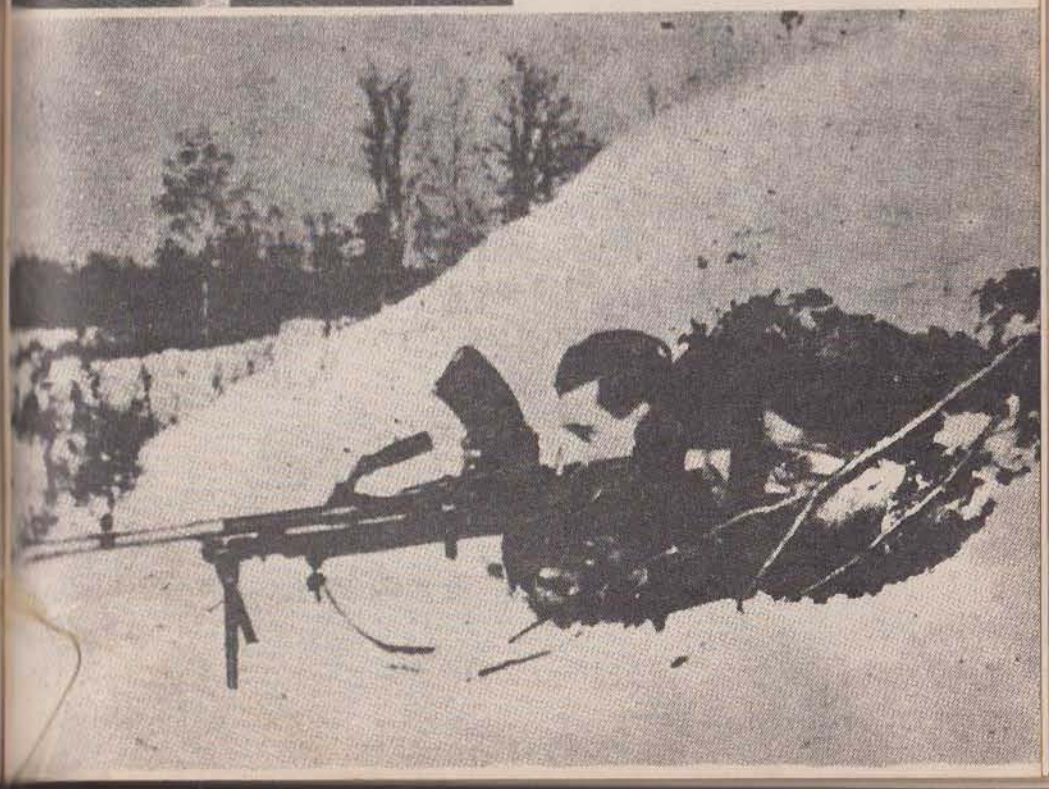

প্যারিসে পত্রিকা অফিসে, ১৯৪৫ ; (বাঁয়ে) কামন্দা, (ডানে) মাল্‌রো।

'আমার ডান পাশে আছেন, সব সময় থাকবেন...এই প্রতিভাধর বন্ধু...'—প্রেসিডেন্ট দ্য গোল (ডানে), সংস্কৃতিমন্ত্রী মাল্‌রো ও হিমালয়—অভিযাত্রী যুবমন্ত্রী মোরিস এরযোগ, ১৯৬০

শিল্পতাত্ত্বিক মাল্‌রো : 'নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর' অনুসন্ধান, ১৯৫১

জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে, ১৯৫৮

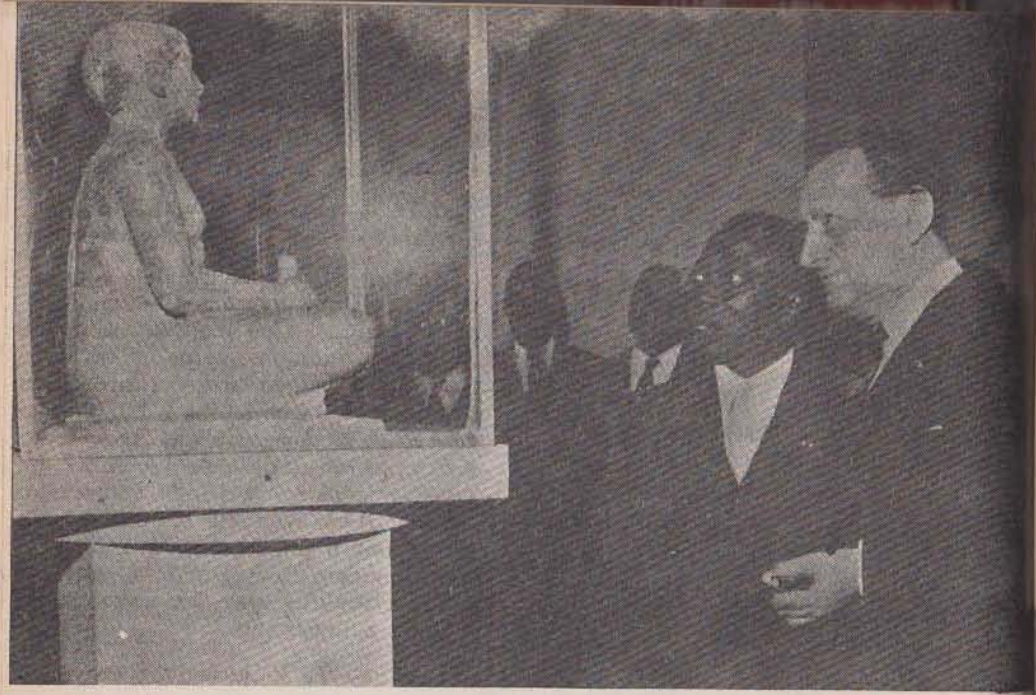

লেওপোল্‌দ সেদার স'ঘরের সঙ্গে, লুভ্‌র ম্যুজিয়মে, ১৯৬১

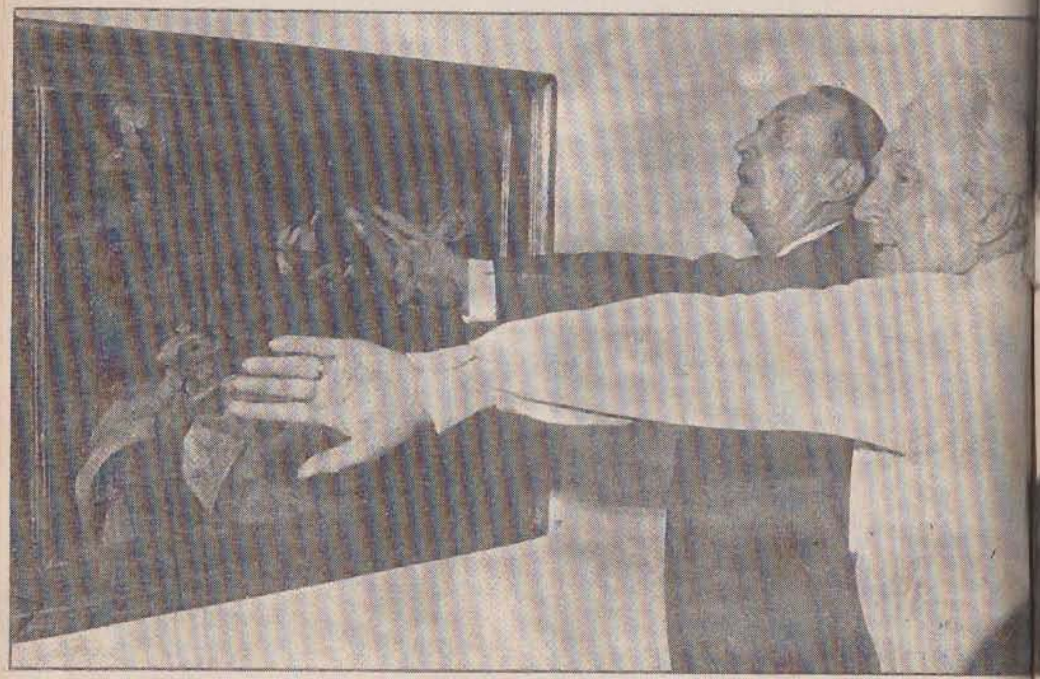

মার্ক শাগালের সঙ্গে মাল্‌রো, ১৯৭৩

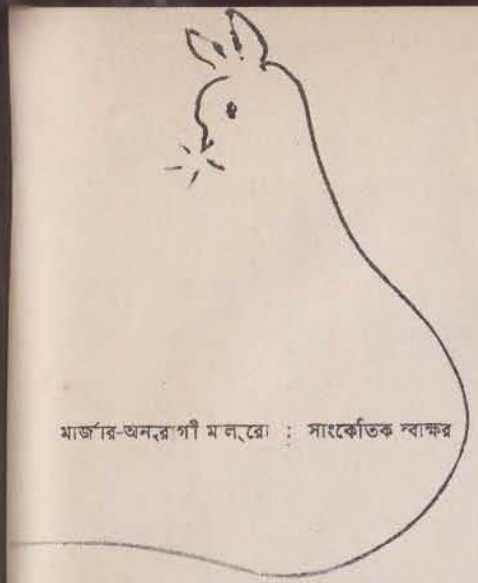

মার্জার-অনুরাগী মাল্‌রো : সাংকেতিক স্বাক্ষর

মাও-জে-দঙের সঙ্গে, ১৯৬৫

ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক ও মাল্‌রো, ১৯৬৯

জিওকোমেত্তি প্রদর্শনীতে

ওয়াশিংটনে 'মোনালিসা' ।
জাক্‌লিন কেনেডির সঙ্গে, ১৯৬৩

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে নেহেরু পুরস্কার গ্রহণ করছেন, ১৯৭৪

দ্য গোলের নীতির সমর্থনে মিছিল, মে ১৯৬৮

কিংবদন্তীর নায়ক

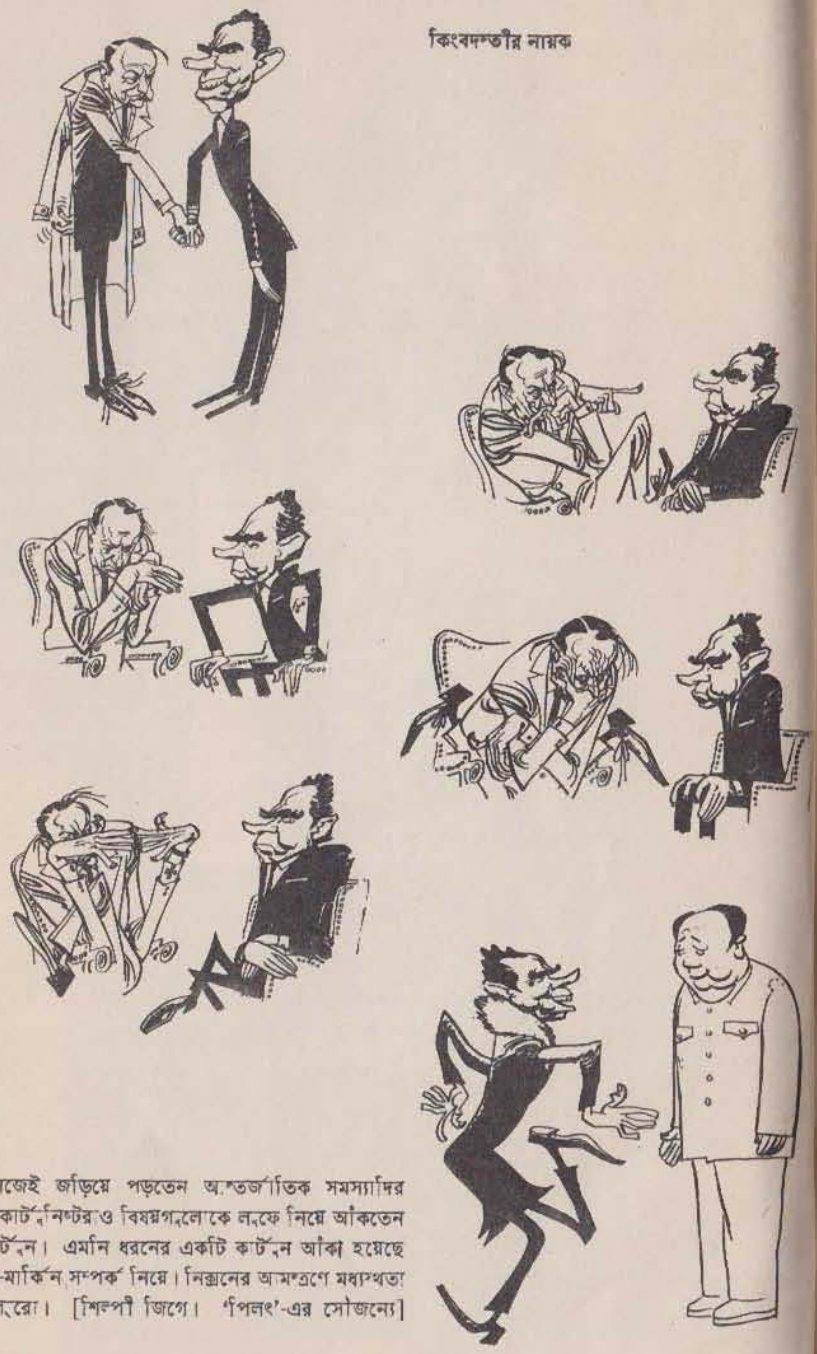

মাল্‌রো নিজেই জড়িয়ে পড়তেন আন্তর্জাতিক সমস্যাদির সমাধানে। কার্টুনিস্টরাও বিষয়গুলোকে লক্ষে নিয়ে আঁকতেন হাজারো কার্টুন। এমনি ধরনের একটি কার্টুন আঁকা হয়েছে ১৯৭২ চীন-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে। নিক্সনের আমন্ত্রণে মধ্যস্থতা করছেন মাল্‌রো। [শিল্পী জিগে। 'পিলং'-এর সৌজন্যে]

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল। ফ্রান্সে তখন ক্ষমতায় আসীন জনফ্রণ্ট সরকার। স্পেনেও কিছু আগে নির্বাচিত হয়েছে বামপন্থী জনফ্রণ্ট। কিন্তু ডানপন্থীরা নানা অজুহাতে সে সরকারকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছিল না। পরের বছরের জুলাইয়ে মাল্‌রোদের সাহিত্য সম্মেলনটি হবার কথা মাদ্রিদে। এর প্রস্তুতির জন্যে ১৭ই মে মাল্‌রো এসে পৌঁছুলেন স্পেনে। প্রসঙ্গক্রমে হিস্পানী-বন্ধুদের তিনি বলছিলেন: সংস্কৃতি অর্থে মানুষ যা বোঝাতে চায় তা' একটি মাত্র ধারণায় সীমায়িত করা যায়; সেটি হলো, নিয়তিকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা। বিপ্লব মানুষকে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই দেয় না। প্রত্যেকের উচিত এই সম্ভাবনাকে অধিকারে আনা।'

দেশে ফেরার পর দু'মাসও অতিবাহিত হয়নি। স্পেনে ঘটলো সামরিক অভ্যুত্থান। তবে দুশো জেনারেলের মধ্যে ১৮০ জন ভিন্নমত পোষণ করলো। এদিকে নানা গড়িমসীর পর সরকার জনসাধারণের মধ্যে অস্ত্র বিলি করে দিলো। শুরু হয়ে গেল শতাব্দীর শোচনীয় গৃহযুদ্ধ। পরবর্তী আড়াই বছর চলেছে এক অভাবিতপূর্ব নিধনযজ্ঞ। অবশ্য সেই সঙ্গে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে এক আশ্চর্য আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য এবং মাল্‌রো কথিত 'পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্ব'।

ঘটনার বিবর্তনে মাল্‌রো মূহ্যমান। অবশ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। একটা কিছু করবার কথা ভাবছিলেন তিনি। সুযোগও এলো একটা। তাঁর বন্ধু বৈমানিক কনিগলিওঁ-মলিনিয়ে, যাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন মরু অভিযানে একদিন তাঁকে জানালেন যে, তিনি সত্বর স্পেনে প্রজাতন্ত্রীদের পাশে সাংবাদিকের দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন। ফরাশি বৈমানিক-লেখক স্যাঁতেগ্‌জুপেরী ও যাচ্ছেন অন্য একটি পত্রিকার পক্ষে। মাল্‌রো সহযাত্রী হলেন। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তাঁর থাকা চাই, অবশ্যই। ফরাশি গণতন্ত্রীদের জন্যে তিনি ঘটনার বিবরণ উপস্থাপিত করবেন, আপাতত এই অভিপ্রায়। আসলে তিনি ইতোমধ্যেই বৈধ সরকারের পক্ষাবলম্বন করে, তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। শুধু সরেজমিনে গিয়ে সেই ভূমিকার বাস্তবায়ন বাকি।

মাদ্রিদে সস্ত্রীক এলেন মাল্‌রো। ক্লারা ও মাল্‌রোর বন্ধুরা জানতেন যে সাফল্যের সম্ভাবনা কম। সহানুভূতি জানানো ছাড়া তাঁদের তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু মাল্‌রো এক গভীর ভাবনায় আত্মমগ্ন। মাদ্রিদ থেকে

গেলেন বার্সেলোনা। সেখানে প্রত্যক্ষ করলেন যুদ্ধের দৃশ্য যা' কিছু পরে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'লেস্‌পোয়ার' (আশা) উপন্যাসে। মাল্‌রো লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিস্পানী সরকারের সবচে' বেশি প্রয়োজন বিমান ও বৈমানিকের। মাল্‌রোর এই পর্যবেক্ষণ সমর্থন পেলো তাঁর বন্ধুদের। স্পেনের পঞ্চাশটি বিমানের অর্ধেক ছিলো মরোক্কোয়। উড়ে এসে বিমানগুলো অবতরণ করছিলো সেভিয়ায়। ওরা জানতো না যে সেভিয়া তখন শত্রুর কবলে। বিমানগুলোকে দখল করে বৈমানিকদের গুলি করে হত্যা করলো ফ্রাংকোর বাহিনী। মাল্‌রো দ্রুত প্যারিসে ফিরে এলেন এবং স্পেনের জন্যে আরো বিমান যোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

ফরাশি সরকারের দু'জন মন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট একমত হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন বিমান সরবরাহের বিরোধী। স্পেনে তাঁরা অল্প-স্বল্প সাহায্য পাঠিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে চাইলেন। বিমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে মাল্‌রোর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিছু কাজ দিলো। তাঁর এক শ্যালকের যোগাযোগ ছিলো এক বিমান কোম্পানীর সঙ্গে। তাও ব্যবহার করা হলো। হিস্পানী সরকারের নানা কেনাকাটা, চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ইত্যাদিতেও সহায়তা করলেন মাল্‌রো। অনেক চেষ্টার পর ফরাশি সরকারের পক্ষ থেকে গোটা বিশেক পতেজ—৫৪০ বিমান যোগাড় হলো। ঠিক হলো, ৮ই আগষ্ট তিনি নিজেই এগুলো নিয়ে স্পেনে যাবেন। আরো গোটা দশেক ব্লক-২০০ বিমান অল্পদিনের মধ্যে পাঠানো হবে। এছাড়া, নিলামের দরে কেনার আয়োজন সমাপ্ত করলেন কয়েকটি বিমান। সেদিনই মাদ্রিদ পৌঁছে তিনি একটি বিমানবহর গঠন ও পরিচালনার অনুমতি পেলেন। এর নাম হলো 'এস্‌পাঁইনা এস্‌কাদ্রিই' বা 'মাল্‌রো এস্‌কাদ্রিই' (স্কোয়াড্রন)। হিস্পানী সরকার তাঁকে 'কর্নেল উপাধি দিয়ে ভূষিত করলেন। পোশাক ও পদমর্যাদায় সচেতন চঞ্চল বুদ্ধিজীবী বদ্ধপরিকর হলেন জীবন দিয়ে অধিকারকামীর মর্যাদা রক্ষা করতে। সাত মাস চলে তাঁর এই নতুন সংগ্রাম। এক একটি যুদ্ধে মাল্‌রো অংশগ্রহণ করেন আর এক একটি দৃশ্য তাঁর মনে গাথা হয়ে যায় পরবর্তী উপন্যাসের জন্যে। সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়, সব অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যায় পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্বে। কী জীবন! আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও বীরত্ব প্রদর্শনের কী সুযোগ। কিন্তু মাল্‌রোর এই অংশগ্রহণ নিয়েও শোনা যায় নানা মুনির নানা মন্তব্য। মাল্‌রো কি বিমান চালাতে পারতেন? তিনি

কি বোমা ফেলতে জানেন? বিমান বাহিনী পরিচালনার প্রশিক্ষণ কি তাঁর ছিলো? অবশ্যই ছিলো না। কিন্তু যাকে বলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, তাঁর ছিলো সদিচ্ছা ও সৎসাহস। মাল্‌রোর অসামান্য বুদ্ধি ও সাহস তাঁকে সহায়তা করেছে এই নেতৃত্বে। তাছাড়া তাঁর ভদ্রতার ও রসিকতার জন্যে মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মী সবাই ছিলো খুশী। তারপরও আছে সাহিত্য খ্যাতি, আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিচয়। হিস্পানের সরকার-প্রধান থেকে রুশ রাষ্ট্রদূত সবাই তাঁকে খাতির করছে! এসময়ে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করা হলো স্পেনের জন্যে। তাতে যোগ দিতে এলেন মাল্‌রোর পূর্বপরিচিত অনেক সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। নানা সূত্রে জানা যায়, মাল্‌রোর অধীনস্থ ভাড়াটে বা ভলণ্টিয়ার বৈমানিক-যোদ্ধারা সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেদিন। এবং তাদের কৃতিত্বের সিংহভাগ অর্পিত হয়েছে প্যারিসের এক নার্ভাস ডানে-বামে দোদুল্যমান সাহিত্যকর্মীর। এই তো মধ্যতিরিশের অঁদ্রে মাল্‌রো। ইংরেজরা তাঁর মধ্যে দেখলো এক নব-বায়রনের রূপ। কিন্তু নিজের উপমা তিনি নিজেই। রুশ পক্ষে স্পেনে উপস্থিত এরেন বুর্গ, প্রাভদা প্রতিনিধি কোলৎসভ, হিস্পানী কম্যুনিষ্ট নেতা পোল নাথম্ব (জুলিয়ঁ সেইঁনের) উচ্চকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করেছেন। সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন চিলির পাবলো নেরুদা, মার্কিন জনডোস পাসোস ও হেমিংওয়ে, হিস্পানী কবি রাফায়েল আলবের্তি ইংল্যাণ্ডের ষ্টিফান স্পেণ্ডার ও আরো অনেকে। বিভিন্ন সূত্রে এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, যুদ্ধের পর যুদ্ধে মাল্‌রো জেনারেল ফ্রাংকোর সেনাবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধের জন্য অত্যন্ত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বোমা বর্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনেক পরে মাল্‌রো তাঁর এই অংশে গ্রহণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন; "হিস্পানী প্রজাতন্ত্রী এবং সাম্যবাদীদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি সেই মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি যাকে আমি বৈশ্বিক বলে মনে করি। এক হিস্পানী সাম্যবাদী নেতা মাল্‌রোর এই ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন: 'হিস্পানী যুদ্ধ মাল্‌রোকে আকর্ষণ করেছিল সম্ভবত এ কারণে যে, সীমিত সম্বল সত্ত্বেও একটি উপযুক্ত ভূমিকা তাঁর আছে। সেখানে তিনি অত্যন্ত সফল।'

মাল্‌রোর এই জীবনমরণ সংগ্রামের সময় ক্লারা এসে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পরে তিনি প্যারিসে ফিরে যান। এসময় থেকে দু'জনের

মধ্যে দেখা যায় বিসম্বাদ যা' পরবর্তীতে রূপ নেয় বিবাহ-বিচ্ছেদে। ক্লারা অবশ্য আইনগত বিচ্ছেদে সম্মত হননি এবং মাল্‌রো নাম আমৃত্যু ব্যবহার করে গেছেন। পরে তিনি মাল্‌রোর সঙ্গে তাঁর নানা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন কয়েক খণ্ডে।

এদিকে নভেম্বরের মধ্যভাগে (১৯৩৬) মাল্‌রো-বাহিনী মাদ্রিদ থেকে চলে গেল আলবাসেৎ শহরে। হিস্পানী সরকারও সরে যায় বন্দর নগরী ভালেনসিয়ায়। তখন তিনি চেষ্টা চালান ভাড়াটে বৈমানিক, যন্ত্রী ও সৈন্যের বদলে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কাজ চালাতে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডও গঠিত হয়েছে। দু'টি কাজ করছে আলাদাভাবে। ডিসেম্বর মাসে মাল্‌রোর স্কোয়াড্রনটি চলে আসে ভালেনসিয়ায়। এসময়ের অঁদ্রে মাল্‌রোর ছবি এঁকেছেন ইলিয়া এরেনবুর্গ, তাঁর স্মৃতিকথায় : "শীতে (১৯৩৬-৩৭) ভালেনসিয়াতে আমি প্রায়ই মাল্‌রোর সাক্ষাৎ পেতাম। তাঁর স্কোয়াড্রনটি আস্তানা গেঁড়েছে আশে পাশেই। তিনি সব সময় একটি উদ্যোগে নিবিষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে যখন পরিচিত হয়েছিলাম তখন তিনি মুগ্ধ ছিলেন প্রাচ্য বিষয়ে। তারপর দস্তয়েভস্কি এবং ফকনার নিয়ে, এরপর বিপ্লব এবং শ্রমিকদের বিষয়ে। ভালেনসিয়াতে তিনি ফাসিস্তদের ওপর বোমা নিক্ষেপ ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতেন না, আমি যখন সাহিত্য নিয়ে আলাপ জমাতে চেষ্টা করতাম তিনি চুপ থাকতেন অথবা বিরক্তি নিয়ে শুনে যেতেন।" (মেমোয়ার্স : ১৯২১-৪১; ক্লীবল্যাণ্ড : ওয়ার্লড পাবলিশার্স পৃঃ ৩১৫-৯৬) এরেনবুর্গকে নিয়ে অথবা একা মাল্‌রো প্রায়ই রুশ রাষ্ট্রদূতের কাছে যেতেন বিমান দিয়ে অথবা অন্যভাবে সামরিক সাহায্য জোরদার করানোর উদ্দেশ্যে।

বড়দিনের পূর্বাহ্নে, মাল্‌রো নির্দেশ পেলেন যে অন্তত দুটি বিমান নিয়ে তেরুয়েল আক্রমণ করতে যেতে হবে। দিনটি ছিলো ২৬শে ডিসেম্বর। মাল্‌রোর বিমান উড়তে গিয়ে ঘুরপাক দিয়ে পড়ে গেল। সৌভাগ্যবশত খুব সামান্য আঘাত পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অন্য বিমানটি গিয়ে গোপনে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর ওপর বোমা ফেলে ফিরে আসছিল। কিন্তু সামরিক জান্তার একটি বিমান এসে তাদের ওপর হামলা করে। পরদিন মাল্‌রো খবর পেলেন, বিমানটির যোদ্ধাদের মধ্যে আলজেরীয় বেলকাদি শহীদ হয়েছেন এবং অন্যান্যরা বিশেষ করে তাঁর বন্ধু মারেশাল মারাণ্ডক ভাবে আহত। নিজের আঘাত ভুলে, এমনকি ঘটনাস্থলে শত্রু উপস্থিত কিনা

তা' উপেক্ষা করে, তিনি চলে যান বন্ধুদের উদ্ধার করতে। তাঁদের নিয়ে আসেন নিরাপদ স্থানে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই সব অতিমানবীয় সাহসিকতায় কিছু ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে এবং তারই কাহিনী সমস্ত তীব্রতা নিয়ে উপস্থাপিত তাঁর 'এসপেয়ার' (আশা) উপন্যাসে এবং তার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একই নামের চলচ্চিত্রে। ফেব্রুয়ারীতেও তাঁর স্কোয়াড্রন কাদিজ, মালাগা প্রভৃতি শহরে ফ্রাংকো বাহিনীর অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে সচেষ্ট থাকে। মালাগার শরনার্থীদের উদ্ধারের জন্য সৈন্যদের ওপর বিমান আক্রমণ খুবই কার্যকর হয়েছিল বলে 'হিস্পানী গৃহযুদ্ধের' ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই সংগে স্কোয়াড্রন লীডার মাল্‌রোর সামরিক কার্যকলাপ শেষ হয়ে এলো। বেশীর ভাগ বিমান তখন উড্ডয়নক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, বৈমানিক বন্ধুদের অনেকেই আহত অথবা নিহত। তিনি নিজেও আহত। এমতাবস্থায় তিনি অন্যধরনের কাজের ভাবনায় আত্মনিবিষ্ট হলেন---হিস্পানীদের সাহায্যকল্পে প্রথমে প্যারিসে ফিরে বুদ্ধিজীবী সম্মেলন আহ্বান তারপর মার্কিন মুলুক বক্তৃতা সফরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ, সাতমাস লড়াই করা এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা এবং বৃহত্তর জনসমাদরের জন্যে তার চলচ্চিত্রায়ন কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব, উদ্যোক্তা যদি হন অঁদ্রে মাল্‌রো!

মার্চ মাসে মাল্‌রো গেলেন মার্কিন মুলুকে। বার্কলে, প্রিন্সটন, হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে এসেছে তাঁর নিমন্ত্রণ। মাল্‌রোর বক্তৃতা আমেরিকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং হিস্পানী জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। মাল্‌রোর সঙ্গে ছিলেন সুন্দরী এবং সুলেখিকা জোজেৎ ক্রুতিস। ক্লারার কারণে তাঁরা আইনগত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন নি। কিন্তু থাকছিলেন একসাথে। হলিউডে তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলো, আপনার মতো এমন বিখ্যাত ব্যক্তি কেন স্পেনে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করছেন? মাল্‌রো ইংরেজীতে জবাব দিলেন: 'বিকজ আই ডু নট লাইক মাইসেল্‌ফ'। শ্রোতারা নাকি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই জবাবে। উত্তর-আমেরিকার সানফ্রানসিসকো, ওয়াশিংটন, টরোণ্টো এবং মণ্ট্রিয়ালেও যান মাল্‌রো। মণ্ট্রিয়ালে এক বৃদ্ধ শ্রমিক এসে তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি দিয়ে যান এবং বলেন "স্পেনের বন্ধুদের দেবার জন্যে এর চেয়ে মূল্যবান জিনিশ আমার আর নেই।"

এপ্রিলের মাঝামঝি তিনি দেশে ফেরেন। তারপর স্পেনে গেলেন, সে দেশের প্রেসিডেণ্ট আজাইনার হাতে মার্কিন মুলুকে সংগৃহীত অর্থ প্রদানের জন্য। এখন লিখছেন নতুন উপন্যাস 'এস্‌পেয়ার' (আশা)। ৩রা জুলাই আবার স্পেনে গেলেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে। এরেনবুর্গের সাথে সহযাত্রীরূপে এক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলেন আশ্চর্যজনক ভাবে। গোলা বারুদ ভর্তি এক ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ীর ধাক্কা লাগে।

মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে মাল্‌রো লিখলেন তাঁর সবচে' সুন্দর বই, 'এসপোয়ার' (আশা)। এই উপন্যাসে তিনি দেখাতে চাইলেন— কল্পনার ওপর বস্তুতান্ত্রিক সত্যের জয়, 'হওয়ার' চাইতে 'করা'র বিজয়। এতে তিনি সাংবাদিকের রিপোর্টকেও ব্যবহার করেছেন স্পেনের বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে মূর্ত করে তুলতে। গ্রন্থটির অংশ বিশেষ প্রকাশ করেন আরাগোঁ, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নভেম্বর মাসে (১৯৩৭)। যুদ্ধের আগুন নিয়ে যেমন চলছে আমরন প্রতিযোগিতা তেমনি সৌভ্রাতৃত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ও মানুষ রাখছে তার অন্তর্নিহিত মহত্বের পরিচয়।

বইতো লেখা হলো, এখন মাথায় চাপল আরেক খেয়াল। সিনেমায় রূপান্তরিত করতে হবে এই সব অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামী চেতনা। এই চিন্তাটা এসেছে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে সফরে গিয়ে। সেখানকার বন্ধুবান্ধবরা বলেছিলেন এর অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের কথা। সাহিত্য সম্মেলনে গিয়ে মাল্‌রো হিস্পানী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এই ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পুরনো বন্ধু বৈমানিক করনিগ্‌লিও-মলিনিয়ে প্রযোজনার দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। ভালো এক স্বেচ্ছাসেবক সহকর্মীর দল যোগাড় করলেন মালরো। হিস্পানী সাহিত্যিক মায়া আউব চিত্রনাট্যে রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মাল্‌রো নিজেই পরিচালক। সবই সম্ভব তাঁর পক্ষে, যখন যেটাতে লাগেন, শেষ না দেখে ছাড়েন না। সিনেমা তাঁকে আশৈশব আকর্ষণ করেছে। দশবছর আগেও তাঁর সিনেমা করার কথা মাথায় এসেছিল। এবার সত্যি সত্যি নেমে পড়েছেন। ছবির কাজ হবে বার্সলোনা বন্দরে। এদিকে নিকটবর্তী মাইয়োর্কা থেকে ফাসিস্ত বিমান প্রায় বোমা ফেলে যাচ্ছে। তবু চলল শুটিং। কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে যাতে অনেক একস্ট্রার প্রয়োজন। প্রথমাবধি সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন যে, পুরো বই নয়, তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলো থেকে বিশেষ কিছু

দৃশ্য নির্মিত হবে। প্রতীকের ব্যবহার অবশ্য থাকবে। মাল্‌রো ৩৯টি দৃশ্য পরিকল্পনা করেন। তবে চিত্রায়িত হয় ২৯টি মাত্র। বার্সেলোনা বন্দর ছাড়াও কাছাকাছি গ্রামে, মোঁসেরা পাহাড়ে এবং ফ্রান্সেও কিছু দৃশ্য চিত্রায়িত হয়। ১৯৩৮ সালের ২০শে জুলাই শুরু হয় চিত্রগ্রহণ পরবর্তী জানুয়ারীতেই ফ্রাংকোর সেনাবাহিনী বার্সেলোনা দখল করে। তড়িঘড়ি মাল্‌রো সদলবলে চলে আসেন ফ্রান্সে। জুলাই পর্যন্ত ছবিটির কাজ চলে। মাসখানেকের মধ্যে ছবির দু'টি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা দেখেছেন তারাই মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সেই সেপ্টেম্বরে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তখন স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত-জর্মন চুক্তি এবং শুরু হয় যুদ্ধ। কুম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং সেন্সর প্রথা প্রবর্তিত হয়। বিপ্লবী ছবি বলে 'সিয়েরা দে তেরুয়েল' তথা 'এস্‌পোয়ার,' নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। এরপর নেহাৎ সৌভাগ্যক্রমে ছবিটি নিশ্চিত ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। অধিকৃত ফ্রান্সে জর্মনরা ভুলক্রমে 'এসপোয়ারের' জায়গায় প্রযোজকের আরেকটি ছবি নষ্ট করে। সে ছবিরও অন্য কপি থাকায় তাও রক্ষা পায়। নানা অসম্পূর্ণতা ও দোষত্রুটি সত্ত্বেও এটি এক অসাধারণ ছবি—মানবিক ও বৈপ্লবিকগুণে সমৃদ্ধ। পরে, ১৯৪৫ সালে ছবিটি সবচে' মৌলিক ছবি হিশেবে ফ্রান্সের 'দল্যুক' পুরস্কার পায়।

ইউরোপের তখন ঘোরতর দুর্দিন-হিস্পানী গৃহ-যুদ্ধের রক্তাক্ত পরিণতি দেখেও কেউ উচ্চবাচ্য করলো না কম্যুনিষ্ট জুজুর ভয়ে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধ এলো ঘনিয়ে। ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৯। স্তালিন আর হিটলারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। মাল্‌রো সে রাতে হিস্পানী কম্যুনিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু, চলচ্চিত্রের সহকর্মী মাক্স আউবের সঙ্গে নৈশভোজন করতে বেরিয়েছিলেন। সে রাত্রেই তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো : 'এই মূল্যে আর বিপ্লবের প্রয়োজন নেই।' তবু কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন মাল্‌রো। জোজেৎ ক্লতিসকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন প্যারিসের বাইরে। হিস্পানী যুদ্ধের পূর্বাহ্নে 'শিল্পের মানস্তত্ত্ব' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হন। আবার শুরু করতে গিয়ে নতুন যুদ্ধের ডামাডোলে বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধে যোগদানরত বিদেশীদের বিশেষ করে, হিস্পানী শরনার্থীদের সাহায্যকল্পেও নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তিনি। (দ্র. সিমন দ্য বোভোয়ার : 'লা ফর্‌স্ দ্য লাজ্' পৃঃ ৩৯৮)।

ফ্রান্সে তখন শুরু হয়েছে প্রতিরোধের সংগ্রাম। স্পেনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কর্নেল মালরো স্বদেশে যে কোন ছোটখাট পদেও বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অভিলাষী। কিন্তু তাঁকে নেওয়া হলো না কোন পদে। একবার ভাবছেন, পোলাণ্ডের সেনাবাহিনীতে গিয়ে যোগদান করেন। অবশেষে তিনি এক ট্যাংক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলেন। ট্যাংকের প্রতি তাঁর ছিলো রোমান্টিক আকর্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর পিতা এবং তাঁর প্রিয় নায়ক লরেন্স অব এ্যারাবিয়া ট্যাংক যুদ্ধ করেছিলেন, তাই সে অভিজ্ঞতা না হলে মাল্‌রোর সংগ্রামী অভিজ্ঞতা তো পূর্ণ হচ্ছে না। এই সময়ে তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একরাতে তিনি লটবহর কাঁধে হেঁটে তিরিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এক সন্দেহভাজন অনুগামীকে বিস্মিত করেছিলেন। তবে বেশীর ভাগ ট্যাংক ছিলো অকেজো। পায়ে হেঁটেই শত্রুসেনার ওপর আক্রমণ চালাতে হতো। একবার তিনি আহত হলেন। আঘাত খুব বেশী নয়। দিনটি ১৯৪০ সালের ১৫ই জুন। পরদিন তিনি ধরা পড়লেন জর্মনদের হাতে। সহযোদ্ধা ছিলেন জঁ গ্রো-জঁ যিনি পরে 'নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ'—এর সহ-পরিচালক হন এবং 'কোরআন' অনুবাদ করেন। এক সুযোগে এক পাদ্রীসহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন মাল্‌রো।

দ্রুত মুক্ত এলাকায় চলে আসতে প্রয়াস পাচ্ছেন মাল্‌রো। ওদিকে প্যারিসে জোজেৎ জন্ম দিলেন তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান গোতিয়ে-র। শীঘ্রই তাঁরা মিলিত হলেন ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে। ডিসেম্বরে (১৯৪০) এলেন নীস্ শহরে। অঁদ্রে জিদও আছেন সেখানে। এক মার্কিন প্রতিষ্ঠান তাঁকে বিদেশে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলো কিন্তু মাল্‌রো বললেন, আপাতত তাঁর প্রয়োজন কিছু অর্থের। তাদের মাধ্যমে মাল্‌রোর মার্কিন প্রকাশক র‍্যানডম হাউস তাঁকে নিয়মিত টাকা দিয়ে যেতে লাগলো। মাসে মাত্র ৭৫ ডলার তাঁর প্রয়োজন। প্রকাশকের কাছে পাঠালেন গত কয়েক মাসে লেখা 'লা ল্যুৎ আভেক লঁজ' (দেবতার সঙ্গে সংগ্রাম) গ্রন্থের কিছু অংশ। এর প্রথম খণ্ড পরে 'লে নোইয়ে দ্য লাল্‌তেনবুর্গ' (কাঠবাদাম গাছ ১৯৪৩) শিরোনামে সুইজারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়। মাল্‌রো এর দ্বিতীয় খণ্ড এবং শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এগুলোতে তাঁর বিশ্ব-বীক্ষা, ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপরূপ দার্শনিক প্রজ্ঞায় মূর্ত হয়েছে। ক্রমে এ এলাকায় একজন অতিপরিচিত ব্যক্তিত্ব—মাল্‌রো নিরাপত্তার অভাব বোধ

করলেন। তাই চলে গেলেন অন্য এলাকায়। প্রথমে পুরনো বন্ধু শভাস্সোঁর কাছে কলোঁবিয়ে (আলিয়ে)-তে—এর পর আসেন পেরিগর এবং লৎ এলাকার মাঝামাঝি এক জায়গায়, সাঁ শাঁমতে। গ্রামীণ পরিবেশ, প্রচুর স্বদেশী শরণার্থী। সেখানেই ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র সন্তান, ভাঁগঁ—জন্ম-গ্রহণ করে। এ সময়ে সৎভাই রোলঁর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। মুক্তি-যোদ্ধা রোলঁকে লণ্ডন থেকে প্যারাস্যুটে কাছাকাছি কোথাও নামানো হয়েছিল। সে ও তার বন্ধুরা প্রায়ই মাল্‌রোর কাছে আসতো। পরে জর্মনরা তাদের গ্রেফতার করে। এই ঘটনা ঘটে ২১ মার্চ, ১৯৪৪। এর পর মাল্‌রো স্বয়ং মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন। একবার তিনি বলছিলেন 'আমার মতো লেখা যারা লেখে তাদের তো যুদ্ধ না করে উপায় নেই।' তাই হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে গেলেন একদিন। জোজেৎ দুই পুত্র নিয়ে গেলেন দম গ্রামে। সেখানে রয়েছেন মাদ্‌লেন। মাত্র বছর খানেক আগে রোলঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর আর রোলঁ তখন কারাগারে, নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায়।

মাল্‌রো এখন নতুন নামে পরিচিত। তিনি স্বয়ং কর্নেল বের্‌জে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'লে নোইয়ে দাল্‌তেনবুর্গ' এর নায়ক। চারমাস বিভিন্ন এলাকায় অপারেশনে ব্যস্ত। তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব তাঁকে দিয়েছে নেতৃত্বের অবারিত সুযোগ। এই এলাকায় প্রায় পনের হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি একত্র করে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তায় চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হলো সবাই। তিনি যে কারু দাবী মেটাতে পারছেন বা কাউকে কিছু দিয়ে খুশী করছেন তা' নয়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে জুনের পর সবাই তাঁর অধীনে উঠে বসে এবং তাঁর নেতৃত্বে তৃপ্ত। ২২শে জলাই অপরাহ্ন তিনটার দিকে কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ মাল্‌রো প্রবেশ করছিলেন লৎ-এর এক গ্রামে। হঠাৎ মুখোমুখি উপস্থিত একদল জর্মন সেনা। কিছু গুলি বিনিময় হল দুপক্ষে। পায়ে গুলি লাগায় মাল্‌রো বেশীদূর পালাতে পারলেন না। ধরা পড়লেন। পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা আছে তাঁর স্মৃতি কথা 'অঁতিমোমোয়ার' গ্রন্থে। তাঁকে গুলি করার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এবারও বেঁচে গেলেন তিনি। শুধু তাই নয়, অনিবার্য অত্যাচার থেকেও রেহাই পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জর্মনরা বন্দী বেরজে তথা মাল্‌রোকে নিয়ে যায় তুলুজের কারাগারে। কিন্তু মিত্রপক্ষের আক্রমণের ফলে জর্মনরা সে শহর পরিত্যাগে বাধ্য হয় অকস্মাৎ।

১৯৪৪ সালের অগষ্টের শেষ দিক। মাল্‌রো এলেন প্যারিসে। মুক্তির আনন্দে উল্লসিত প্যারিস। হেমিংওয়ের সঙ্গে দেখা। সেই হিস্পানী যুদ্ধের পর আবার দেখা। এদিকে জর্মন-অধিকৃত আলজাসকে মুক্ত করার জন্য এক নতুন বাহিনী গঠিত হলো। দেড় হাজার প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত মুক্তি-যোদ্ধা। আবার মাল্‌রোকেই অনুরোধ জানানো হলো নেতৃত্ব দেবার জন্য। যাদুকর বটে! (আল্‌তেনবুর্গের নায়ক ভ্যাঁসঁ বেরজে যেমন বলে: "আমি তো কাহিনী বানাই। কিন্তু একসময়ে দুনিয়াটাই আমার কাহিনীর মতো দেখাতে শুরু করে")। ৩রা সেপ্টেম্বর। সাহিত্যিক অঁদ্রে শঁসোঁ যোগ দেন তাঁর দলে। তখন এর নাম হয় 'লা ব্রিগাদ আলজাস্‌-লরেন'। শঁসো পরে বলেছেন, "ব্রিগেড গঠন করি আমি, জাকো তাকে চালাতে শেখান আর মাল্‌রো তাতে জীবন দান করেন' (অঁ লা কুতুর-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তদীয় মাল্‌রো জীবনী, পৃঃ ২১৮) অচিরে তিনটি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় দু'হাজার। পরবর্তী ছ'মাস ধরে চললো অনেকগুলো খণ্ড যুদ্ধ। ১১ নভেম্বর, ১৯৪৪। এক জটিল 'অপারেশনে' মাল্‌রো ব্যস্ত। এইদিনে এলো তাঁর জীবনের সবচে' বড় দুর্ঘটনার খবর। তাঁর দু' সন্তানের জননী জোজেৎ ক্লতিস হয়েছেন এক দুর্ঘটনার শিকার। ট্রেন চাপা পড়েছেন। মাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু আপন সন্তানদের কাছে আর ফিরে যেতে পারেন নি। স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো মাসখানেক আগে। সিদ্ধা, প্রেমময়ী জোজেৎকে মালরো ধর্মীয় বা আইনগতভাবে বিয়ে করে শান্তি দিতে পারেন নি। অশান্ত সময়ের কারণেও অস্বস্তিকর দিন কাটাতে হয়েছে তাঁর-এই দুঃখ মাল্‌রো বুকে চেপে রেখেছেন। আর তাঁর যন্ত্রণার শেষ মুহূর্তগুলো অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন তাঁর স্মৃতি কথায়। জোজেৎ-এর শেষকৃত্যের জন্য তিনদিন থেকে বন্ধুদের কাছে দুই শিশুপুত্র রেখে তিনি প্যারিস হয়ে ফিরলেন। প্যারিসে 'কোঁবা' পত্রিকার অফিসে আলবের্ কাম্যুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। রণক্ষেত্রে ফিরে তাঁর বাহিনীর সবচে' শক্ত 'অপারেশান' দানমারি দখলের অভিযান পরিচালনা করেন (২২-২৮ নভেম্বর)। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়ছিল সেবার সর্বত্র। বরফের পাথর। এর মধ্যে মাল্‌রো বাহিনীর ৪০ জন সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তাঁরা স্ত্রাসবুর্গ শহর অধিকারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে আরো কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়। এপ্রিল মাসে ফরাশি মার্শাল দ্য লাৎর মাল্‌রোকে

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করে ন। মাল্‌রো সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর এক সম্মেলনে যোগ দেন প্যারিসে। তখন থেকে ক্রমশ তিনি দ্য গোল পন্থীদের দলে ভিড়ে পড়েন।

এভাবে শেষ হলো মাল্‌রোর সংগ্রামী জীবনের অতন্দ্র প্রহর। জীবন শুরুতে অগোছালো ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্য বিপ্লবের সঙ্গে। তা' নিয়ে লিখেছিলেন 'বিজয়ী' যদিও বিজয় লাভ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন তিনি বা তাঁর সহানুভূতি যাঁদের ঘিরে, তাঁরা। এরপরে প্রগতিশীল ভাবধারায় অবগাহন করে বুর্জোয়াতন্ত্র, নাজী ও ফ্যাসীবাদের মৃত্যু কামনা করেছিলেন। তাই রুশবন্ধু ও সাম্যবাদীদের সহযোগী হয়েছিলেন, হিস্পানী যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে পৌরুষিক সৌভ্রাতৃত্বে গতিশীল হয়েছিলেন। কিন্তু এতেও বিজয় সূচিত হয়নি। এবার স্বদেশে শেষ ক'মাসের মুক্তি সংগ্রামে জীবনবাজী রেখে যুদ্ধে নেমে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন মাল্‌রো। অতীত যেমন তাঁর এই সাফল্যের কারণ হয়েছে তেমনি তাঁর বর্তমান তাঁর জন্যে বয়ে এনেছে আরো গৌরবের জয়টীকা যা' সৌভাগ্যক্রমে তাঁর প্রতিভার দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আগামী দিনের অনুরাগীদের জন্য।

'সব পাখি ঘরে আসে...'

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫। স্ত্রাসবুর্গের রণক্ষেত্রে বসে এক সাক্ষাৎকারে মাল্‌রো জানান: 'আমার কাছে যার মূল্য সবচে' বেশী তা' হলো শিল্প। অন্যরা যেমন ধর্মভক্ত আমি তেমনি শিল্পানুরক্ত। কিন্তু শিল্প কোনো কিছুর সমাধান আনে না। অন্তরকে ভরে তোলে শুধু...শিল্প যদি কেবল সুন্দরই হতো গইয়াকে শিল্পী বলা যেত না। শিল্পে অসুন্দর সম্পর্কেও কিছু বলার আছে। তাই বলবো এবার।' (রজে স্তেফান: ফ্যাঁ দ্যু'ন জন্‌স পৃঃ ৪০—৬১)। হিস্পানী গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণের আগে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মাল্‌রো 'শিল্পের মনস্তত্ত্ব' লিখতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন বারবার। যুদ্ধান্তেও আসে বিপত্তি। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর পূর্বাহ্ন পর্যন্ত শান্তভাবে, শৃংখলার সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে যা' লিখবেন ভেবেছিলেন তাতো লিখেছেনই, তাছাড়া নতুনতর ভাবনা-চিন্তা বা সমালোচকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনালোচিত বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। রাজনীতি, সাহিত্য-চর্চা, অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি কিছুই আটকাতে পারেনি তাঁকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের দেশগুলোতে চলে অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ভাংগাগড়া। দলবদল তখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মাল্‌রো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনো যুক্ত ছিলেন না সরাসরি। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তাঁর একটা রাজনৈতিক ভূমিকা এসে গেল অনিবার্যভাবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বীকৃত হলো। সে সময়ে খুব অগ্নি-বর্ষী বক্তৃতা করতেন মাল্‌রো। আচমকা অকম্যুনিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। এবং এব্যাপারে তাঁর সমর্থকও জুটে গেল প্রচুর।

কিন্তু মাল্‌রোর তখন কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা ছিলো। জোজেৎ ক্রতিস-এর শোচনীয় মৃত্যু তাঁকে মারাত্মকভাবে শোকাহত করেছিলো। বিশেষ করে, তাঁর দুই শিশুপুত্র তখন অন্যের ঘরে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অভাবগ্রস্ত ফ্রান্সে মানুষ হচ্ছে। দুই সৎ ভাইও মারা গেছে যুদ্ধে। সবচে' ছোট ক্লোদ ছিলো খুব এডভেঞ্চার-প্রয়াসী। সেন নদীতে জর্মন জাহাজ ডুবাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, ১২ই মার্চ ১৯৪৪ সালে। তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

রোলঁর কথা আগে বলেছি। নাৎসী বিরোধী এক সশস্ত্র সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলো সে। জর্মনদের হাতে গ্রেপ্তার হলে আরো অনেক বন্দীসহ এক জাহাজে তাকে পাঠানো হচ্ছিল কোনো জর্মন বন্দরে। কিন্তু জর্মন পতাকা দেখে মার্কিন বিমান গুলি করে ডুবিয়ে দেয় জাহাজটি। শান্তি চুক্তির মাত্র চারদিন আগে ঘটে এই ট্র্যাজিক ঘটনা। অঁদ্রে এই ভাইয়ের প্রতি ছিলেন খুবই স্নেহাসক্ত। ভাইটি কম্যুনিষ্ট কবি আরাগোঁর পত্রিকা 'এই সন্ধ্যা'র প্রতিনিধি রূপে মস্কোতে ছিলো বেশ কিছু দিন। রাজনৈতিক মতামত নির্ধারণে তার বক্তব্যের ওপর অঁদ্রে অনেকটা নির্ভর করতেন। রোঁলর যোগাযোগ সূত্রেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। অত্যন্ত সুশ্রী ও সুরুচিসম্পন্ন রোলঁর স্ত্রী মাদ্‌লেন ছিলেন দক্ষ পিয়ানো-বাদিকা। ১৯৪৮ সালে মাদলেন রোলঁর এক পুত্র নিয়ে অঁদ্রের গৃহিণী হয়ে যান।

এখন আমরা ফিরে যাই ১৯৪৫ এর গ্রীষ্মে। এক সন্ধ্যায় দ্য গোলের একজন সহকর্মী এসে মাল্‌রোকে জিজ্ঞেস করলেন: জেনারেল জানতে চান, 'ফ্রান্সের নামে' আপনি তাঁকে সাহায্যে করতে প্রস্তুত আছেন কি না। পরে এ সম্পর্কে মাল্‌রো লিখেছিলেন: 'আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু খুব বেশী নয়। নিজেকে প্রয়োজনীয় ভাবতে আমি অভ্যস্ত কিনা...।' ('অঁতি মেমোয়ার' পৃঃ ১২৫-১২৬)। কিন্তু কেন যেন ডাক এলোনা তখন। ২০শে নভেম্বর দ্য গোল সরকার গঠন করলে মাল্‌রোকে নিয়োগ করেন তথ্য মন্ত্রী। দ্য গোলের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ নিয়ে মাল্‌রোর বহু সমালোচনা হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা বলবো, বয়স ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দুজনেই রাজনীতিকে অতিক্রম করে এমন কিছু ঐতিহাসিক মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও শিল্প-চেতনা দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন যে, আমৃত্যু তাঁরা তা শ্রদ্ধা ও প্রীতি বশে লালন করেছেন। তাই জেনারেল দ্য গোল (১৮৯০-১৯৭০) পরে তাঁর আত্মজীবনীতে অঁদ্রে মাল্‌রো প্রসংগে লিখেছেন: 'আমার ডান পাশে, আমার কাছে আছেন এবং সব সময় থাকবেন অঁদ্রে মাল্‌রো-ঊর্ধগামী নিয়তিতে যাঁর একান্ত বিশ্বাস। আমার পাশে এই প্রতিভাধর বন্ধুর উপস্থিতি আমাকে এই আশ্বাস দেয় যে আমি এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে পর্যাপ্ত ভাবে আচ্ছাদিত। আমার সম্পর্কে এই অতুলনীয় সাক্ষীর যে ধারণা তা' আমাকে প্রত্যয়ী হতে সহায়তা করে। আমি জানি, বিতর্কের সময় যখন বিষয়টি হয়ে পড়বে জটিল এবং গুরুগম্ভীর তখন তাঁর শিল্পসুষমামণ্ডিত বিশ্লেষণ আমার সামনে

থেকে ছায়া সরিয়ে নিয়ে যাবে।' ('মেমোয়ার দেস্‌পোয়ার ১ ল রনুভো', পৃ. ২৮৫)

মাল্‌রোর এই মন্ত্রীত্ব টেকে দু'মাসের জন্যে। কিন্তু এটি ছিলো এক ব্যতিক্রমী মন্ত্রণালয়। এখানে হয়েছিলো অনেক প্রতিভার সমাবেশ। এর সচিব ছিলেন জাক্ শাবঁ-দেল্‌মাস (বর্তমানে জাতীয় সংসদের সভাপতি), অন্যতম কর্মকর্তা প্রখ্যাত দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রেয়মোঁ আরোঁ, (জঁ-পোল্‌সার্ত্র্‌এর সহপাঠী)। মাল্‌রো তখনই তথ্য মন্ত্রণালয়ে শুরু করেছিলেন অনেক কাজ যা' শেষ করতে পারেন নি এবং তেরো বছর পর আবার ধরবেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে গিয়ে। তখনই ভেবেছেন 'সংস্কৃতি ভবন' প্রতিষ্ঠার কথা। তাছাড়া প্রবর্তন করতে চাইলেন চিত্রে জনসংস্কৃতির প্রচার, বেতারে গণশিক্ষা এবং জনমত যাচাইয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। শেষোক্ত ব্যাপারে তখনই তিনি একজন ফরাশি সমাজবিজ্ঞানীকে কিছু অর্থ মঞ্জুরী দেন। এভাবেই ফরাশি দেশে জনকল্যাণকর কিছু অভিনব কর্মপন্থার শুরু।

মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও রাজনৈতিক সভাসমিতি, নৈশভোজন চলতে লাগল। কিন্তু তাঁর নিজের কাজেও যত্নবান হলেন। অল্প দিনের মধ্যে বেরুলো : 'এস্‌কিস্ দ্যুন প্‌সিকলজি দ্যু সিনেমা' (চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব) 'সেন্ শোয়াজি' (নির্বাচিত দৃশ্যাবলী, 'ল তঁ দ্যু মেপ্রি' থেকে)।

৪ঠা নভেম্বর (১৯৪৬) নবগঠিত ইউনেস্কোর উদ্যোগে সর্বনে তিনি এক দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন সংস্কৃতি বিষয়ে, পাশ্চত্যের শিল্প ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল দ্য গোল 'রাসঁব্‌লমঁ দ্যু প্যপ্‌ল ফ্রঁসে' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ঘোষণা দেন। মাল্‌রোকে নিতে হয় এর প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব। প্রথমে একটি বুলেটিন, পরে একটি সাপ্তাহিক এবং একটি মাসিক পত্র প্রকাশের ও ব্যবস্থা হয়। এরপর দীর্ঘদিন কাটে মাল্‌রোর ভাষায়, দ্য গোল পন্থীদের জন্যে 'মরুভূমি অতিক্রম'। ১৯৫০ এর গ্রীষ্মে প্যারাটাইফয়েডে ভুগে তিনি বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকেন৷ এর মধ্যে শিল্প সম্পর্কিত পুস্তকাবলীও প্রকাশ পেতে শুরু করছে : 'ল্য ম্যুজে ইমাজিনের' (কল্পিত যাদুকর) বের হলো ১৯৪৭, 'লা ক্রেয়াসিয়োঁ আর্তিস্তিক' (শৈল্পিক সৃষ্টি) ১৯৪৮-এ, ১৯৫০ 'ল মনেয়্ দ্য লাব্‌সল্যু' 'সাতুর্ন' এবং 'লে ভোয়া দ্যু সিলঁস্' (নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর) ১৯৫১ সালে 'লা মেতামোরফোজ দে দিউ' (দেবতাদের রূপবদল)। এভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিল্প বিষয়ক

আরো বহু রচনা তিনি লিখতে লাগলেন। তাঁর শিল্পতত্ত্ব নিয়েও উপস্থাপিত হয়েছে কিছু বিতর্ক কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁর গ্রন্থগুলো মহৎ এবং অত্যন্ত মূল্যবান প্রকাশনা। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তাঁর দীর্ঘ ভাবনাচিন্তা এক দার্শনিক প্রকাশভংগীতে অভিব্যক্ত : সুসমঞ্জস, স্থায়ী এবং বৈশ্বিক পটভূমিতে অস্তিত্বশীল মানুষ। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, রোম তার পবিত্র মন্দিরেও স্থান দিতো বিজিত জাতির দেবদেবীদের। আবার চীন বীর শত্রুদের কবর দিয়ে এপিটাফ লিখতো : আগামী জীবনে এখানে জন্মগ্রহণ করে আমাদের সম্মানিত করবেন। ('নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর', পৃঃ ৬২৯-৬৩৭)। এভাবে বিশ্ববোধ ও সৌভ্রাতৃত্বের নতুনতর ইংগিত মাল্‌রোর রচনায়। শিল্প যে নিয়তি-নিরোধ। তাইতো শিল্পে তাঁর এত আগ্রহ।

১৯৫২ সালে আবার গ্রীস, মিশর, ইরান এবং ভারত ভ্রমন করে এলেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারীতে গেলেন ন্যুইয়র্কে, তৃতীয় বারের জন্যে। সঙ্গে আছেন মাদ্‌লেন। এবার এসেছেন শিল্পের ইতিহাস ও যাদুঘর সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে। এর মধ্যে 'ভেরমীর'-এর ওপর বই শেষ করলেন। ফরাশি বীর 'সঁ্যা জঁ্যুস্ত' এর ওপর একটি সুন্দর ভূমিকা লিখলেন, তার বন্ধু আল্‌বের অলিভিয়ে-র বইয়ের জন্যে। উল্লেখ্য যে, সঁ্যা জ্যুস্ত মাল্‌রোর মহিমাণ্বিত নায়কদের একজন। ইতোমধ্যে ফরাশি সরকার তাঁদের উপনিবেশ আলজেরিয়ার মুক্তিপিয়াসী মানুষের ওপর চালাচ্ছিলো অকথ্য নির্যাতন। মাল্‌রোর কাছ থেকে এলো এর উপযুক্ত প্রতিবাদ। নবেল পুরস্কার বিজয়ী দুই লেখক রজে মার্তঁ্যা দ্যু গার এবং ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক্-এর সঙ্গে জঁ-পোল্ সার্ত্র এবং অঁদ্রে মাল্‌রো স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হলো পত্র-পত্রিকায়। এ-এক দুর্লভ দৃশ্য বটে! কারণ বিবৃতি স্বাক্ষরে মাল্‌রোর কোনো আগ্রহ নেই, বিশেষ করে সার্ত্রের সাথে।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের সংকট ক্রমশ বেড়ে গেল। জেনারেল দ্য গোল্ আবার এলেন ক্ষমতায়। আর এসেই ডেকে পাঠালেন মাল্‌রোকে। জেনারেল এর সঙ্গে মাল্‌রোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তখনকার দ্য গোল-সমর্থক বামপন্থীদের এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে ছিলো এক ধরনের আশ্বাস। ১৯৫৮-র ১লা জুন দ্য গোল্ মন্ত্রীসভা গঠিত হলো। কিছুকাল এদিক-ওদিক থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত হলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। এটা ফরাশি দেশে

বা পশ্চিমা জগতের প্রশাসন ব্যবস্থায় এক পরিবর্তন বটে। শিক্ষা, তথ্য প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কিছু বিষয়ে কিছু ডেস্ক বা পরিদপ্তর থাকতো আগে। প্রথম বেশ কিছুদিন আলজেরিয়ার সমস্যা নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত রইলেন সবাই। কাম্যু, মোরিয়াক, মার্ত্যাঁ দ্যু গার-এই তিন নবেল পুরস্কার-বিজয়ীদের দিয়ে তিনি একটি পর্যবেক্ষণ-দল পাঠাতে চাইলেন সেখানে; পরে কাম্যুকে বিশেষ দূত রূপে প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কেউ যেতে রাজী হলেন না। ব্যর্থ হলো তাঁর প্রয়াস। নানাকারণে ফরাশি সরকারের ভাব-মূর্তি খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল এই সময়। তা দূর করার জন্যে মাল্‌রোকে পাঠানো হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ভারতে। জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নেহরু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে মাল্‌রো যখন স্পেন থেকে ফিরে হাসপাতাল ছেড়ে বেরুচ্ছেন এবং নিজে মুক্তি পেয়েছেন সবে জেল থেকে, তখন তাঁদের শেষ দেখা। প্রথম সাক্ষাতে মাল্‌রো নেহেরুকে খুব বিব্রত করেছিলেন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে: বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতো সুসংগঠিত ধর্মীয় শক্তিকে হিন্দুরা খুব বড় ধরনের সংঘাত ব্যতিরেকেও দেশছাড়া করে দিয়েছিলো কীভাবে? হিন্দু ধর্মই বা কি করে এই জনপ্রিয় ধর্মকে আত্মসাৎ করেছিলো? তার সেই জীবনী শক্তি কি এখনো আছে? থাকলে ভারতের আর ভাবনা নেই। অবশ্য নেহেরু এই ধরনের প্রশ্ন পছন্দ করতেন এবং নিজেও নিজেকে করতেন, প্রয়াস পেতেন উত্তর খুঁজে বের করতে। মাল্‌রোর চিন্তাশীলতা ও কর্ম প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন নেহেরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে।

জুন ১৯৫৮ থেকে এপ্রিল ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ফরাশি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সরকারী সদস্য (অর্থাৎ মহামান্য মন্ত্রী)। কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কখনো আগ্রহী হননি। ১৯৬২-র ৭ই ফেব্রুয়ারী উপনিবেশবাদী ফরাশিরা তাঁর বাড়ীতে বোমা রেখেছিল। মৃত্যু তাকে আবারো রেহাই দিলো কিন্তু ৫ বছরের একটি মেয়ে তার একটি চোখ হারায়। এর ছয় সপ্তাহ পর আলজেরিয়ার স্বাধীনতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাল্‌রো মার্কিন মুলুকে যান কেনেডির অতিথিরূপে।

সংস্কৃতি মন্ত্রী হিশেবে তাঁর সাফল্য কোথায়? এই প্রশ্নের সদুত্তর দান অসম্ভব না হলেও শক্ত। তবে এক দশকের ওপর তিনি যে পৃথিবীর সবচে' সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব বলে খ্যাতিমান, ফরাশি দেশের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক,

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অতিথি মাল্‌রো, ১৯৭৩

রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে

তেজগাঁ বিমান বন্দর : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন ১৯৭৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিচ্ছেন মাল্‌রো। (ডানে) দোভাষীরূপে গ্রন্থকার এবং (বাঁয়ে) ফরাশি রাষ্ট্রদূত মিলে

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মাল্‌রো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: আবদুল মতিন চৌধুরী পদক খাওয়াচ্ছেন মাল্‌রোকে। পাশে গ্রন্থকার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট লাভের পর ভাষণরত মাল্‌রো, ১৯৭৩

চট্টগ্রাম কলাভবনে শিল্পাচার্যের ছবি হাতে মাল্‌রো। জয়নুল আবেদীন, রশীদ চৌধুরী, গ্রন্থকার, দেবদাস চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা।

চট্টগ্রামে নাগরিক সংবর্ধনা : সভাপতি অধ্যাপক আবদুল ফজল

চট্টগ্রাম আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি গ্রন্থকার এবং সদস্যবৃন্দের সঙ্গে (ডানে) সঁফি দ্য ভিল্‌মোর‍্যাঁ, মাল্‌রোর শেষ-সঙ্গিনী।

শিল্পপতি এ. কে. খান-এর বাসভবনে। মাদাম মিলে ও ফরাসি রাষ্ট্রদূত।

গ্রন্থকারের কাছে মাল্‌রোর একান্ত সচিবের পত্র ২৬.১০.১৯৭১

2, RUE D'ESTIENNE D'ORVES
91.VERRIERES-LE-BUISSON
TÉL. 920.36-79

Le 26 Octobre 1971

Dr. N.S. GURESHI
c/o Consul Général de France
Park Mansions
Park Street
CALCUTTA

Inde

Monsieur,

Monsieur André Malraux vous remercie de votre lettre, il pense venir, en effet, en Inde pour une mission préparatoire, et vous fera signe à ce moment là.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Corinne Godfernaux

Corinne Godfernaux

গ্রন্থকারের কাছে মাল্‌রোর পত্র ৮.৫.১৯৭৩

2, RUE D'ESTIENNE D'ORVES
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
TÉL. 920-30-03

le 8 Mai 1973

Dr. N.S. QURESHI
Head of the Dept. of Languages
University of Chittagong
CHITTAGONG
Bangladesh

Mon cher Professeur,

De retour à Paris (avec le livre que vous m'avez si aimablement dédicacé), je tiens à vous dire la mémoire amicale que je conserve de notre collaboration. Vous m'avez beaucoup aidé; et sans vous, ma relation avec nos auditeurs de Chittagong n'eût point été ce qu'elle fut. L'intelligence, la rapidité, le ton, de vos traductions, ont établi une communication, et quelquefois une communion, dont je vous suis reconnaissant. Espérons que nous pourrons maintenant mener à bien ce que nous avons entrepris pour votre pays, qui est devenu un peu le mien, et croyez, mon cher Professeur, à mon bien sympathique souvenir,

André Malraux

André Malraux

মাল্‌রো তাঁর শেষ নিবাস ভেরিয়ের—বাগানে, কবি লুইজের সঙ্গে, ১৯৭০

বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনায়করূপে ক্ষমতাসীন, সেটি খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। তদুপরি ফরাশি রাষ্ট্রপ্রধানের বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিরূপে তিনি ফরাশি দেশে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন যা' সম্ভবত অন্য কারু পক্ষে সম্ভব হতো না। দেশের সর্বত্র সংস্কৃতিভবন প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর একটি প্রধান প্রকল্প। এটি এক সময়ে খুবই সাফল্য অর্জন করেছিলো। প্রথমে প্যারিসে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য মফস্বল শহরের দালানগুলোর শতাব্দীর ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করবার প্রকল্পও সাফল্যজনক ভাবে সমাধা করেন তিনি। পাথরের কালো বাড়িগুলো উজ্জ্বল ধবধবে শাদা বা ধিয়ে রঙে পরিণত হয়ে 'আলোক শহর' প্যারিসের মর্যাদা দিলো বাড়িয়ে। মাল্‌রোর পরিকল্পনা মত ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলো বাইরের পৃথিবীতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিসেবীদের কৃতজ্ঞতা এবং সংকীর্ণমনা কিছু ফরাশির নিন্দা তিনি কুড়িয়েছেন। এই পর্যায়ে বিখ্যাত মোনালিসা ('মনালিজা' ব 'লা জকোঁদ') যায় মার্কিন মুলুকে এবং 'ভেন্যুস দ্য মিলো' যায় জাপানের শহরে। আরেকটি বড় কাজ করেছেন মাল্‌রো। ফ্রান্সের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ শিল্পবস্তু। এগুলোর সুসংবদ্ধ তালিকা ছিলো না। রাষ্ট্রীয় আয়োজনে তিনি এগুলোর 'রেপের্‌তোয়ার' তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন—এভাবে অনেকগুলো শিল্পবস্তু নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অপেরা, থিয়েটার, সংগীত, শিল্পের উন্নয়ন, ও প্রদর্শনীর ব্যাপারে নানা নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যা অন্যান্য উন্নত দেশ এখনো পর্যন্ত চালু করতে সমর্থ হয়নি।

কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সীমাবদ্ধতা ছিলো। প্রথমত ফরাশি দেশের গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় সমাজতন্ত্রী দেশের মতো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালানোর নীতি গ্রহণযোগ্য ছিলো না। তাই সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কতটুকু এর আওতায় আসবে তা ঠিক করা প্রথমদিকে খুবই দুঃসাধ্য ছিলো। দ্বিতীয়তঃ এই মন্ত্রণালয়ের জন্য যে অর্থ দেওয়া হতো (জাতীয় বাজেটের ০.৪৩ মাত্র) তা' প্রয়োজনের তুলনায় ছিলো নগণ্য। তাছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেও এই মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড আঁদ্রে মাল্‌রোর অভিপ্রায় অনুযায়ী গভীর ও ব্যাপক হতে পারেনি। এখানে মাল্‌রোর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬১-র বসন্তকালে তাঁর দুই পুত্র একসঙ্গে মারা যায় এক মোটর দুর্ঘটনায়। ষোল বছর আগে ট্রেনে চাপা পড়ে এই দুই ছেলের মা জোজেতের

মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর আমরা জেনেছি। এবার গেল কলেজে পড়ুয়া দুই সন্তান। বড় ছেলে গোতিয়ে (২১) এবং ভ্যাঁসঁ (১৮) তাদের গাড়ীতে ফিরছিল বাইরে সপ্তাহান্ত কাটিয়ে। ঠিক একবছর আগে কাম্যু যেখানে গাড়ী দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তারই কাছাকাছি জায়গায় মাল্‌রো পুত্রদ্বয় অকালে প্রাণ দিলো। সে সময়ে আবার তাঁর একমাত্র কন্যা ফ্লোরঁস্‌ও আলজেরিয়ার পক্ষাবলম্বন করে সরকার তথা রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি এক দীর্ঘসূত্রী অসুস্থতায় ভুগছেন। তাছাড়া বিচ্ছেদ ঘটে বিগত ষোল বছরের জীবন-সঙ্গিনী মাদ্‌লেনের সঙ্গে।

১৯৬৮ সালের মে মাসে ফরাশি দেশে এলো এক নতুন বিপ্লবের ঢেউ। তিন সপ্তাহের ছাত্রআন্দোলন ও ধর্মঘট দ্য গোল সরকারের আইন-শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড করে দিলো। ফরাশি রাজনীতিতে এলো পরিবর্তন। পরের বসন্তকালে সংঘটিত হলো এক গণভোট যা' মালরোর মতে ছিলো দ্য গোলের রাজনৈতিক আত্মহত্যা। দ্য গোল্‌ পদত্যাগ করলে তিনিও মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। অবশ্য পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট পোঁপিদু, যিনি এককালে ছিলেন 'প্রফেস্যর' এবং মাল্‌রোর 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ' সংকলন করে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, নতুন কোনো পদ গ্রহণের আহ্বানও জানাননি মাল্‌রোকে। সবাই জানতো যে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাই ছিলো বেশী।

ইতোমধ্যে মাল্‌রো সম্পন্ন করেছেন তাঁর জীবনের এক কৃতিত্বময় কাজ— তাঁর স্মৃতি কথা, নাম 'অঁতিমেমোয়ার' (১৯৬৬)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাস্তব ও কল্পনার এমন আশ্চর্য সংমিশ্রণ, চিন্তা ও ঘটনার এমন অভূতপূর্ব মিলন অন্য কোন বইতে সম্ভবত আমরা দেখি না। এক সাক্ষাৎকারে মাল্‌রো বলেছেন : 'এটা আমার সত্য বই। আমি প্রুস্তের কথা ভাবি। শাতোব্রিয়ঁর পর 'দু কোতে দ্য শে সোয়ান্‌' লিখে তিনি নতুন কিছু করা অসম্ভব প্রতীয়মান করেছেন। প্রুস্ত তাই 'অঁতি' (ইংরেজিতে এ্যান্টি বা এ্যাণ্টাই/ শাতোব্রিয়ঁ। শাতোব্রিয়ঁ আবার অঁতি-রুস্‌সো। আমি হতে চাই অঁতি-প্রুস্ত এবং প্রুস্তের কাজটিকে তার ঐতিহাসিক তারিখে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।'

সম্প্রতি মাল্‌রো বাস করছিলেন তাঁর প্রিয় বান্ধবী লুইজ্‌ দ্য ভিলমোর্যাঁ-র সঙ্গে। লুইজ্‌ একজন ভালো কবি। মাল্‌রো তাঁর কাব্যসমগ্রের ভূমিকা

লিখেছেন। ভিলমোর্যাঁদের বাড়ীটি হচ্ছে ভেরিয়ের ল বুইসোঁ (এস্সন) এলাকায়, প্যারিসের কাছেই। সুবিশাল বাগানসমৃদ্ধ কুঠিবাড়ী, যাকে ফরাশিরা বলে 'শাতো'। তিন বছর একত্রবাসের পর হঠাৎ করে মারা গেলেন লুইজ্‌। জেনারেল দ্য গোল টেলিগ্রাম পাঠালেন : 'আপনার বেদনায় আমিও সহমর্মী।— বিশ্বস্ততায় শার্ল দ্য গোল'। ক'মাস পর তিনি নিজেই পরলোক গমন করলেন (৯ই নভেম্বর ১৯৭০)। ফ্রান্সের দুই মহান সন্তানের দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের অবসান ঘটালো। ১৯৪৩ সালে দ্য গোল তাঁর এক সহকর্মীকে বলেছিলেন যে মাল্‌রোর 'মানব পরিস্থিতি' তাঁর কাছে মনে হয়েছে সবচে সুন্দর সমকালীন উপন্যাস (দ্র. জঁ লা কুতুর, মাল্‌রোজীবনী, পৃঃ 808)। মাল্‌রোও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বরেণ্য নেতারূপে তাঁকে অনুসরণ করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। পরের বছর বেরুলো দ্য গোল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধার্ঘ : 'লে শেন ক'ন আবা' (পতিত ওক, ১৯৭১)।*

মাল্‌রো এখন একা। ভেরিয়েরল বুইসোঁ-র কুঠি বাড়ীতে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ব্রাক, ফোত্রিয়ে, পলিয়াকক প্রমুখের শিল্পকর্ম, কয়েকটি কৃত্রিম বিড়াল, আশ্চর্য সেই নীল 'সাঁলো'-তে (বসবার ঘর) ঘুরে ফিরে, কথা বলে, লিখে, পড়ে সময় কাটান। লুইজ্‌-এর ভাইঝি সফি দ্য ভিলমোর্যাঁ সব দেখাশোনা করেন। সেবাশুশ্রূষা ও মমতা দিয়ে ঘিরে রাখেন অনেক দুঃখ পাওয়া, পোড় খাওয়া বিশ্বের অতিপ্রিয় অতিশ্রদ্ধেয় মহামনীষীকে। একাত্তর সালে এলো তাঁর আরেক পরীক্ষা। দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল অঞ্চলে চলছিলো শতাব্দীর জঘন্যতম নরহত্যা ও অন্যান্য নারকীয় কাণ্ডকারখানা। তাই সে এলাকার মানুষ মাল্‌রোর ভাষায় বলতে গেলে, প্রায় খালি হাতেই রুখে দাঁড়িয়েছিল, এক অসমান শক্তির সঙ্গে প্রাণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ লড়ে যাচ্ছিল। প্রতিবেশী ভারতের সহানুভূতিশীল মানুষের পক্ষ থেকে বিশ্ব-বুদ্ধিজীবীদের একটি

* বর্তমানে এটি তাঁর স্মৃতিকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডের অংশ বিশেষ। এ সম্পর্কে একজন মার্কিন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতি করা যেতে পারে এখানে :

'To read de Gaulle and Malraux even here together when everything had passed them by is to understand the command that fantasy wil forever be able to place upon us : both of them are so much more wonderful than anyone real'. Murray Kempton in **The Newyork Times Book Review**, April 23, 1972.

আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থনের জন্য। অঁদ্রে মাল্‌রোকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। অপারগতা জানাতে গিয়ে তিনি এমন ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে হিস্পানী বিপ্লবের সমর্থক ও বিমান যোদ্ধা 'করোনেল' মাল্‌রো তথা ফরাশি প্রতিরোধের কর্ণেল বের্‌জে মূর্ত হয়ে এলো। সত্তুর বছরের বৃদ্ধ মাল্‌রো যাবেন বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? এটা অনেকের কাছে ঠেকে অবিশ্বাস্য এবং অপ্রাসঙ্গিক (আহা! কী দরকার ছিলো?)। কিন্তু তবু, এই ঘোষণাই সাড়া তুলেছে সারা বিশ্বে। বাংলাদেশের জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা তাদের আলোচনার, দুশ্চিন্তার বিষয় হলো পরবর্তী ক'মাসের জন্যে। এরপর মাল্‌রো এক চিঠি লিখলেন নিকসনকে: আমেরিকা যেন পাকিস্তানকে গণহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য করে এবং যদ্দিন তা' না হচ্ছে তদ্দিন যেন সব সাহায্য বন্ধ রাখে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও প্যারিসে এক ফরাশি তরুণ একটি বিমান হাইজ্যাক করে বাংলাদেশের জন্য ঔষধপত্র দাবী করে। তাকে সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন মাল্‌রো।

ইতোমধ্যেই তিনি 'লা মেতামর্‌ফোজ দে দিয়ো' (দেবতাদের রূপবদল) নতুন করে লিখে দু'খণ্ডের বিরাট গ্রন্থে পরিণত করেন: 'লিররিয়েল্' এবং 'ল্যাতঁপোরেল'। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল ভ্রমণে এলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে এসে তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। বেনারস, অক্সফোর্ড, ফিনল্যাণ্ডের পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। কর্মব্যস্ত চারদিনের সফরে তিনি বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করেছিলেন। নতুন স্বাধীনতা পাওয়া দুঃখী বাংলাদেশও তাঁর আপন হয়ে উঠেছিল।

এসময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করলেন। প্রিয়দর্শিনীর সঙ্গে তাঁর বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে অতীতে। কিন্তু এখন তিনি বিজয়িনীও। 'বিজয়ী'-কে সম্মানিত করতে চাইলেন। পরের বছর এসে নেহেরু পুরস্কার গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। সেবার গিয়ে 'সভ্যতার বাঁচামরা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাল্‌রো এবং পুরস্কারের অর্থ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা-কল্পে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের জন্যে দান করেন।

ভারত-বাংলাদেশ সফরের পর মাল্‌রো নেপালে যান। নেপালের রাজপরিবারের ভীষণদর্শন কালভৈরব তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁর মতে, বাঙালিরা নেপাল জয় করে এই শিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে। নেপালের রাজা ও স্বয়ম্ভুনাথের লামারা মাল্‌রোকে সংবর্ধনা জানান।

১৯৭৩ সালেই সুইজারল্যাণ্ডের প্রকাশক স্কিরা মাল্‌রো, 'রোয়া, জঁ তাতঁ আ বাবিলন' (রাজা, তোমার জন্যে ব্যাবিলনে অপেক্ষা করছি নামে বহুচিত্রশোভিত মূল্যবান গ্রন্থ বের করে। এটি সালভাদর দালী চিত্রিত। অন্যান্য অনেক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৭৬—৭৭ সালে প্রকাশিত 'লেস্‌পোয়ার' (আশা) উপন্যাসের একটি অপ্রকাশিত অংশ 'এ স্যুর লা তের' (এবং পৃথিবীর বুকে, মার্ক শাগাল চিত্রিত) এবং 'লা লিতেরাত্যুর এল'ম্ প্রিকের্' (সাহিত্য এবং পরাধীন মানুষ)।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফ্রান্সে তাঁর সম্মানে আয়োজিত হয়েছিল এক অত্যাশ্চর্য প্রদর্শনী: 'অঁদ্রে মাল্‌রো ও কল্পিত যাদুঘর' (১৯৭৩)। এছাড়া তিনি দেশে বিদেশে উদ্বোধন করেন অসংখ্য শিল্প প্রদর্শনী, ভূমিকা লিখেন বেশ কয়েকটি গ্রন্থের।

এভাবে মাল্‌রো তাঁর জীবনের বাঞ্ছিত অর্থ-বিত্ত-খ্যাতি সবই অর্জন করেছেন। মানবজীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি তাঁকে ভাবিয়েছে কিন্তু মুষড়ে পড়েননি কখনো। অধিকারহননকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, মৃত্যুভয়ে বিচলিত হননি। বিজয়ীর অধিকারে আপন স্বার্থোদ্ধারে প্রয়াসী হননি। তাইতো তাঁকে দেখি, জীবনের শেষ বছরগুলো—এক যুগেরও অধিক, নানাদিক বিচার করলে যে যুগটি শতাব্দীর একটি মোড় নেবার সময়, অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালন করে যেতে। তাঁর এক বন্ধু এমানুয়েল বের্ল-এর বক্তব্যের অনুসারে বলতে পারি: মালরোর কাছেই বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পেল, যাবতীয় সংজ্ঞানির্ণয়ের বিভ্রান্তি এড়িয়ে। অসংখ্য লেখা, ভাষণ, ভ্রমণ ও সাক্ষাৎকারে (একটি দূরদর্শন-অনুষ্ঠান আছে যাতে একশো ঘণ্টার ওপর কথা বলেছেন) তিনি মানব অস্তিত্বের স্বরূপ ও সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো লেখার সমালোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তিনি এগিয়ে আসতেন না। তাঁর বিবেচনায় প্রকাশের পর লেখার প্রকৃত মালিক হচ্ছে পাঠককুল। দু'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে।

কিন্তু তাও সাধারণ বিচার্য বিষয় বলে মনে করে লিখেছেন। এককালে অসামান্য সমাদর লাভ করেছে তাঁর সাহিত্যসম্ভার। আজ এবং আগামীকালও তাই হবে। তাঁর 'স্মৃতি কথা' প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে দু'লক্ষ কপি বিক্রি হয় ফ্রান্সে। সাড়ে তিন লক্ষ ডলার দিয়ে মার্কিন প্রকাশক কেনেন তার স্বত্ব। জর্মন, ডাচ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রকাশকদের মধ্যে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি। তাঁর ওপর শতাধিক গবেষণা-সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। লেখা হয়েছে কয়েক সহস্রাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ। এ মাসেই (নভেম্বর, ১৯৮৬) প্যারিসে প্রকাশিত হলো দু'টি তত্ত্বসমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থ। এই দু'টি গ্রন্থে নতুন বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে জীবনে বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তা ও কর্মে ছিলো গভীর ঐক্য। (দ্র. 'ল মোঁদ—সেলেক্‌সিও এব্‌দোমাদের, এদিসিয়োঁ আঁতের-নাসিওনাল' ২০-২৬ নভেম্বর, ১৯৮৬)। সব মিলে অমরত্বের আসন অনেকটা পাকাপাকি, অঁদ্রে মাল্‌রোর। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আমাদের শতাব্দীর নানা স্বপ্নের সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট অঁদ্রে মাল্‌রোর শিল্প ও সংগ্রাম।

সাহিত্যখ্যাতি, রাজনৈতিক সাফল্য সবই তিনি পেয়েছেন। অনেকগুলো পুরস্কার প্রাপ্তি, চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেট লাভ, এক যুগ ধরে সংস্কৃতি-মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠান তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম প্রমাণ। ইচ্ছে করলে তিনি ফরাশি একাডেমীর সদস্য হতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তা' চাননি। তাঁকে নবেল পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব উঠেছিলো একাধিকবার। ১৯৫৬ সালে নবেল পুরস্কার পেলে আলবের কাম্যু বলেছিলেন, 'আমার নয়, অঁদ্রে মাল্‌রোর পাওয়া উচিত ছিলো এই পুরস্কার। ষাটের দশকে 'অঁতিমেমোয়ার' বেরুলে আবার কিছু জল্পনা-কল্পনা চলে তাঁর নামে। কিন্তু দ্য গোল মন্ত্রিসভার সদস্য বলে সেটা সম্ভবপর ছিলো না। একনায়কত্বের বিবেচনায় সুইডেনে অনেকে তখন দ্য গোল-বিরোধী ছিলেন। যাহোক, মৃত্যুর পর এক ঘোষণা দিয়ে সুইডিশ একাডেমী অঁদ্রে মাল্‌রোকে মরণোত্তর নবেল পুরস্কার-বিজয়ী হিশেবে সম্মান প্রদর্শন করেন। বলা বাহুল্য, এধরনের সম্মাননার এটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

জন্ম ক্যাথলিক পরিবারে, কিন্তু মাল্‌রো আস্তিক বা নাস্তিক কোনোটাই ছিলেন না। নিজেকে তিনি এ্যাগনষ্টিক (অজ্ঞেয়বাদী) বলেছেন একাধিক বার। কিন্তু সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকা তাঁর ভালোভাবেই জানা, তাই ছোট বড় ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠে তিনি ছিলেন অনলস, ধর্মীয় শিল্পের

গুরুত্ব অনুধাবন তাঁর জীবনসাধনার অঙ্গীভূত। দ্য গোল একবার তাঁকে বলেই ফেলেছিলেন : 'আপনি তো বিশ্বাসী নন, তাহলে এমনভাবে কথা বলেন কেন যে আপনাকে বিশ্বাসী মনে হয়?' প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় সহকর্মী পাদ্রী পিয়ের বকেল-এর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ে গভীর তত্ত্বালোচনা চলতো। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁর কাছে মাল্‌রো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে আগামী শতাব্দীতে মানুষের অধ্যাত্মবোধ ও ধর্মীয়-চেতনা বাড়বে। (দ্র. 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ', জুলাই, ১৯৭৭)।

মার্কসবাদের ব্যাপক প্রভাবের যুগে তিনি কর্মক্ষেত্রে ও সংস্কৃতিচর্চায় এগিয়ে আসেন। এই মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মার্কসবাদী অনেককে আপনজন মনে করলেও শেষ অবধি তিনি দূরে অবস্থান করেছেন সম্ভবত অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে। মানুষের দুঃখে তিনি সমব্যথী কিন্তু তথাকথিত মানবতাবাদের প্রবক্তা তিনি নন। তবে তাঁর শিল্প ও কর্মদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে মাল্‌রোর স্বাভাবিক বা ট্র্যাজিক মানবতাবাদের ওপর। যেহেতু তাঁর রচনায় নিয়তি নতুন প্রাসঙ্গিকতায় বারবার উল্লেখিত ('নিয়তি মৃত্যু নয়, আপন পরিস্থিতি অনুধাবনে যা' মানুষকে বাধ্য করে তাই —নিয়তি', 'নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর', পৃঃ ৬২৪)। যেহেতু নিয়তিকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা-ই মানুষের কাজ, তাই মানবসম্পর্কিত ব্যাপক ধারণা ও অভিজ্ঞতার প্রকাশই ছিলো মাল্‌রোর জীবনসাধনা। নির্যাতিত ও অধিকার-উদ্ধারের সংগ্রামে রত মানুষের পাশে তিনি ছিলেন। থাকতেন অধিকার-হননকারীর প্রবল প্রতিপক্ষরূপে। পরের কারণে নিজের আরোপিত নীতিও তিনি উপেক্ষা করেছেন কখনো কখনো। তাই ফরাশি সাংবাদিক ও বিপ্লবীদের অনুগামী রেজি দব্রে-কে বলিভিয়ার জেল থেকে মুক্ত করতে তিনি মোরিয়াক, সার্ত্র প্রমুখের সঙ্গে বিবৃতি দেন। এর আগেও আলজেরিয়ায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেখা গিয়েছিল তাঁর অগ্নিস্বাক্ষর। অথচ কেবল বিবৃতি সই করে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালন করা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন অনেকবার।

মানবঅস্তিত্বের রহস্য উন্মোচন ছিলো তাঁর অন্বিষ্ট। কিন্তু অস্তিত্বের বিপরীতে আছে এক অনমনীয় বাধা--মৃত্যু। তাই মৃত্যুকেও পর্যবেক্ষণ করেছেন নানা সূত্রে। নানা পদ্ধতিতে। মৃত্যুর হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছেন বারেবারে। কিন্তু তখন তাঁর মৃত্যু হয়নি। তাঁর পারিবারিক

ইতিহাসের পাতা ভরেছে এক-একটি অকালবিয়োগে আর অপঘাতের ঘটনায়। সার্ত্র নাকি মাল্‌রো সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, 'তিনি হলেন: মৃত্যুর-জন্যে-একটি-মানুষ'। মালরোর কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা যায় ধাঁধার মতো: 'যদি বলি 'জন্যে' নয়, 'বিরুদ্ধে'? বাহ্যত এক রকম দেখালেও সেটা কি এক কথা হলো?' তাঁর 'বিজয়ী' উপন্যাসের বিপ্লবী নায়ক যথার্থই বলেন: 'শেষ কোথায় সেটা অবহিত হওয়া নয়, এই শেষের পথে তার দায়িত্বটা কী সেটা জানাই তো আসল কাজ।'

গভীর চৈতন্যের মানুষ

লেওপোল্‌দ সেদার্‌ সঁঘর

মৃত্যু এভাবেই তাহলে প্রতিরোধী মাল্‌রোকে ধরাশায়ী করলো। খুব কম মৃত্যুই আমাকে এতখানি বেদনার্ত করতো। আমার শুধু একটাই সান্ত্বনা: তাঁর চিন্তা এবং শিল্প বিশ্বকে বিপ্লবী করেই চলবে।

অল্পবয়েসী অধ্যাপক—অন্য অনেকের মতো আমিও তাঁর বইগুলোর দ্বারা লালিত হচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত পরিচয় ঘটে তিনি যখন জেনারেল দ্য গোল এর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এরপর থেকে একের পর এক অনেকবার দেখা হতে থাকল। তিনি বন্ধু হলেন। আমি বলছি সেই বন্ধুত্বের কথা যা' কাছাকাছির এবং সমানে সমানে, উষ্ণ কিন্তু তথাকথিত ঘনিষ্ঠতাজাত নয়—যেমনটি আমি পছন্দ করি।

জেনারেল দ্য গোল-এর মন্ত্রিরূপে তিনি ১৯৬১ সালে সেনেগালের প্রথম স্বাধীনতা-বার্ষিকীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। তারপর ১৯৬৬ সালে আমরা দুজন একত্রে নিগ্রো শিল্পের প্রথম বিশ্ব-উৎসব উদ্বোধন করি। অবশ্য এরকমভাবে যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তা' নয়, তবে মাল্‌রোর সঙ্গে আমি যে দীর্ঘ সংলাপ শুরু করেছিলাম এ দুই সাক্ষাৎ হচ্ছে তারই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। মৃত্যুর পরেও তা' চলতে থাকবে নিঃসন্দেহে।

এই লেখকের প্রতি আমি যে অনুরক্ত এখানে তারই সাক্ষ্য উপস্থাপিত করতে চাই, উত্থাপন করতে চাই তাঁর দূরদৃষ্টি এবং তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য। কিন্তু সর্বাগ্রে বলবো তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসঙ্গে। আমার মাপকাঠি অনুসারে বিস্তৃততম চৈতন্য-সমৃদ্ধ মানুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এখনও শুনছি মনে হয়, ১৯৬৬ সালে এক নৈশ ভোজনের শেষে তাঁর আলোচনা, তিনি শুরু করেছিলেন গ্রীসের অমুক ষ্টেডিয়ামের বৃত্ত, মিশরের তমুক মন্দিরের কোনাচ এবং তাদের গুরুত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য। এদ্দূর পর্যন্ত আমি বেশ স্বচ্ছন্দে অনুসরণ করে চলেছিলাম। কিন্তু তারপর তিনি চলে গেলেন দূরপ্রাচ্যের শিল্প সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। প্রথমে চীন,

তারপর জাপানের শিল্প। সব গুলিয়ে যেতে লাগল আমার। অনেক কষ্টে তাঁর উপসংহারে অন্তত নিজেকে খুঁজে ফিরে পেতে চেষ্টা করলাম।

লেখক অঁদ্রে মাল্‌রো আমাদের যা উপহার দিয়েছেন সংক্ষেপে তা' হলো, বিশ্ব সম্পর্কে এক গভীর দৃষ্টিভঙ্গি : শুধু মানুষ নয়, বস্তু ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের সামাজিক জীবনই তাঁর লক্ষ্য। শতাব্দী-সূচনায় 'প্যারিস স্কুলে'র শিল্পীরা আবিষ্কার করেছিলেন নিগ্রো শিল্পকলা। তাঁরা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি। এটা এখন সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, নিগ্রো আফ্রিকার সৌন্দর্য-চেতনা আর বিংশ শতাব্দীর শিল্পবোধ অভিন্ন। অনেক মহৎ শিল্পী স্বীকার করেছেন একথা। আর এই চেতনার পরিচয় কাহিনীতে বা চিন্তায় নেই, আছে আকৃতি-কল্পনায় এবং রঙের সুসমঞ্জস মিশ্রণে। এদিকে দেখা যাবে যে কোনো নিগ্রো ভাস্কর, চিত্রশিল্পী বা কুমারের কাছে এটাই প্রধান প্রতিপাদ্য নয়। আসল কথাটি হচ্ছে, যেমন মাল্‌রো বলেছেন, নিগ্রো-আফ্রিকার শিল্পীকে অধিকার করে আছে অতিপ্রাকৃতের ভাবনা। এটাই (স্বদেশবাসী) জড়োপাসকদের সে দেবার চেষ্টা করে। পবিত্রতাই পরিচালনা করে এই বিশ্বকে।

কিন্তু একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিও বিশেষ প্রকাশ-ধারার অভাবে তার শক্তি এবং মূল্য হারিয়ে ফেলে। যদি মাল্‌রোর ভাষা দীর্ঘ অথচ উজ্জ্বল বাক্য ব্যবহারে ব্যাকরণের রীতিনীতিকে বিপর্যস্ত করে থাকে তার কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন ভাষার জনপ্রিয় ধারাকে বহমান রাখার পক্ষপাতী, সেল্‌তিক প্রতিভার হারানো উদ্দীপনাকে ফিরে পেতে আগ্রহী। অপ্রকাশযোগ্যের প্রকাশ ছিলো তাঁর অন্বিষ্ট। এর বড় প্রমাণ সক্রেতিসের মতো তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন সংলাপ যা' আমাদের নিজস্ব সত্যে নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য করে। তার শুরু জেনারেল দ্য গোলকে দিয়েই। তাঁর শেষ দিকের একটি বই 'ওৎ দ্য পাসাজ' (সাময়িক অতিথি) ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত মাল্‌রোর সংলাপ-কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অনেকে মনে করেছেন, এ-এক প্রতিভা-দীপ্ত প্রতারণা। বইটির বত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বর্ণনা পড়ে আমি বিস্ময়াভিভূত। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য যেমন খুঁজে পেলাম, তেমনি দেখলাম সেই বাক্যগুলো, যেমন : "জানেন তো, আমি নিগ্রোত্বের একজন পুরনো সংগ্রামী", "অনুকরণের স্পৃহাকে সৃষ্টির স্পৃহা দিয়ে বদলে দেওয়াই তো নিগ্রোত্বের প্রতিমুহূর্তের কর্তব্য", "বলুন তো,

আফ্রিকার কোন্ প্রেসিডেণ্ট তাঁর নিজের পার্টিতেই সংখ্যালঘু নন?"...এই বাক্যগুলোইতো আমি বলে আসছি নানাভাবে। কিন্তু আশ্চর্য, মাল্‌রো এগুলো গ্রহণ করে অন্য এক পটভূমিতে পুনর্সৃষ্টি করেছেন, নিজস্ব পদ্ধতিতে সমন্বিত করেছেন। তবু আমি এগুলো চিনতে পারছি—তাদের সারাংশে, বিশেষ করে, এগুলোর ধাঁইলে।

এখানেই, নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত হতে পারে মাল্‌রোর প্রতিভা। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের বিশ্বকে, তার দূরদূরান্তের অংশকেও এবং তৈরী করেছেন তার প্রতিরূপের অভিধান। ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টি ভংগীতে বিশ্বের নবজন্ম ঘটিয়েছেন তিনি। এটাই মাল্‌রোর মৌল প্রতিপাদ্য প্রকাশের শিল্প। এ-এক বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি : নিয়তির বিরুদ্ধাচারণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিনি,—এক মহান স্রষ্টার মতো মাল্‌রো তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কিন্তু সর্বজনীন স্বপ্ন নিয়ে পুনর্নির্মাণ করেছেন ব্যক্তিজীবন, মানবজীবন এবং পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহটির সভ্যতাসমূহের। আসলে এজন্যই হয়তো আমরা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলাম নিজেদের। অতীতে এবং পরে—সব সময় ব্যাপারটি হলো স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন প্রকাশের এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের। আমি যাকে বলি 'পয়েজি দ্য লাক্‌সিয়োঁ'—'কর্মের কবিতা', মালরো হলেন তারই রাজটীকা।

[ফরাসি সাপ্তাহিক 'ল্য নুভেল অব্‌সেরভাত্যর,' ২৯ নভেম্বর—৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৬, ৬২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লম দে প্রোফঁদ্যর' প্রবন্ধের অনুবাদ]

বাংলাদেশে মাল্‌রো

একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, একাত্তুর সালের আগে বাংলাদেশে খুব বেশী লোক মাল্‌রোর নাম শোনেননি। এমনকি সাহিত্যকর্মীদের কাছেও সার্ত্র, কাম্যু, ফ্রঁসোয়াজ্‌ সাগঁ প্রমুখ জীবিত লেখক, ভিক্তর‍্যুগো, বোদ্‌লের্‌ মালার্মে, বাল্‌জাক্‌, জোলা প্রভৃতি গত শতকের কবি-কথাশিল্পীরা যে-রকম পরিচিত, সম্ভবতঃ অঁদ্রে মাল্‌রো সেই জনপ্রিয়তা পাননি। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে শুধু 'লা কোঁদিসিওঁ য়্যুমেন' (মানব পরিস্থিতি, ১৯৩৩) বাংলায় অনূদিত হয়েছে ('শাংহাইয়ে ঝড়', ইংরেজী অনুবাদ 'ষ্টর্ম ওভার শাংহাই থেকে তর্জমা। বাংলায় এর একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ রয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য প্রবাহ' গ্রন্থে। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং মাল্‌রো আমাদের জানিয়ে ছিলেন---ইংরেজী অনুবাদটি অত্যন্ত বাজে)।

তিরিশ-চল্লিশের দশকে হয়তো তাঁর পরিচিতি কিছুটা ব্যাপকতর ছিলো, ষাটের দশকে মূলত ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী হিসেবে তিনি খবরের কাগজে কিছু স্থান জুড়ে ছিলেন। তাঁর 'অঁতিমেমোয়ার' (স্মৃতি কথা, ১৯৬৬) প্রকাশের ঘটনা সারা বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ঢেউও এখানে খুব বেশী লাগেনি। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ মাল্‌রোকে আমাদের কাছে এবং বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে পরিচিতির নতুন সুযোগ এনে দিলো। মাল্‌রো-কল্পিত ভুবনের মতো সে ছিলো আমাদের জীবনের আশা-নিরাশার দুরন্ত দিন। বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে তখন মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা। কিন্তু বর্ষান্তে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী নতুন উদ্যমে নারকীয় লীলা চালিয়ে যাচ্ছিলো। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল নবতর সমস্যা। মোল্লা জালাল ও বর্তমান লেখক ছিলেন বৈরুতে। সেখানে যে কূটনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তা' ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবার মতো একটি ঘটনা ঘটে গেল। সংবাদ মাধ্যমগুলোতে একটি বড় খবর প্রচারিত হলোঃ বাংলাদেশের একজন দূত নাকি তেল-আবিব গিয়েছে অস্ত্র সাহায্যের জন্যে এবং ইজরায়েল এই সাহায্য দিতে ইচ্ছুক। এখনো অকহতব্য একটি কারণে আমরা প্রতিবাদলিপি তৈরী করেও তা প্রচার করতে

পারিনি। খুব বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল। এদিকে পাকিস্তানী অনুচরেরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে লেবানন ত্যাগের জন্যে হুমকি দিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে গুরুত্ব নিয়ে এলো অঁদ্রে মাল্‌রোর এক বিবৃতি। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালের কথা। মাল্‌রো বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে শরীক হবার প্রস্তাব দিয়েছেন সে বিবৃতিতে। (অধিকতর তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ, "অঁদ্রে মালরো ও বাংলাদেশ", 'দৈনিক বাংলা' ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৩)।

মাল্‌রোর এই বিবৃতি বিশ্বময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। ঘোষণাটি গড়ে ওঠে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে এক ভারতীয় বন্ধুকে লেখা চিঠির ওপর ভিত্তি করে। উক্ত বন্ধু দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাল্‌রোর জবাবের এবং পরবর্তী বিভিন্ন বিবৃতির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

'বাংলাদেশ, প্রয়োজনের দিক থেকে অহিংস প্রতিরোধের ক্ষেত্র নয়। সে শুধু প্রতিরোধের দেশ হতে পারে এবং তাই-ই হওয়া উচিত। বাঙালিদের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিবাহিনীর একটি ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব আমি চাই। আমার কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা রয়েছে যা' লেখকদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ।

সম্মেলনে অনেক আলোচনার ফলে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধের মালমশলা পাওয়া যাবে কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানীদের ট্যাংক অনেকদূর এগিয়ে যাবে।... তাছাড়া যেসব বুদ্ধিজীবীরাই আজ বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে পারেন যাঁরা বাংলাদেশের জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।...

ফাঁকা বুলি আওড়াবার অভ্যাস আমার নেই, তাই বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করবার প্রস্তাব আমি দিয়েছি।

ট্যাংক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে আমার। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অধীনে একটি ট্যাংক ইউনিটে অংশ গ্রহণে আমি অটল।...

প্রয়োজনবোধে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিতর্ক-সভায় অবতীর্ণ হতেও আমার আপত্তি নেই। ফরাশি নাগরিক হিসেব সেটি সম্ভবপর নয়। সবাই এখন সন্ধির কথা বলছেন, আমি বলিঃ বেশ, কিন্তু এই সময়টিতে যেন বন্ধ থাকে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড।...

আমাদের বন্ধুরা গণতন্ত্রের কথা বলে কেন? বাংলাদেশ তো কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ রক্ষা করতে যাচ্ছে না। সে চাচ্ছে তার নিজের জীবন

রক্ষা করতে। আমরা যদি মরি তো মরব। কিন্তু তাতে তুমি এতোই ক্ষতিগ্রস্থ হবে যে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচতে হবে। বাংলাদেশ তো সব সময় সাহসী দেশ ছিলো। মৃত আদর্শবাদ নিয়ে বাংলাদেশ মেতে থাকতে পারে না বরং বলে উঠতে হবে: হয়তো আমরা সবাই নিহত হবো, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় থাকবো অটল।...'

পরপর আরো কয়েকটি বিবৃতি—সাক্ষাৎকার দিয়ে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে চিঠি লিখে তিনি বাংলাদেশের সমস্যাটিকে ফরাশিরা যাকে বলে, 'আক্‌তুয়ালিতে' অর্থাৎ নিত্য-আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। শোনা যায়, স্পেনের মতো বাংলাদেশের জন্যেও একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড তৈরী হবে ভেবে মাল্‌রোর কাছে অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে পত্র দেন। উল্লেখ্য যে, ব্রিগেডের ব্যাপারটা আসলে একটা ভ্রান্তিজনিত 'মিথ'। কারণ মাল্‌রো উক্ত ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র একটি স্কোয়াড্রন প্রতিষ্ঠা করে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাহোক, সে সময়ে বর্তমান প্রতিবেদকও একটি চিঠি লেখেন মাল্‌রোকে: তাঁর তো একজন বাঙালি দোভাষী দরকার হবে। পত্রলেখক স্বেচ্ছাসেবক হতে রাজী। মাল্‌রোর একান্ত সচিব (?) করিন গদ্‌ফের্‌নো-র জবাবের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ডঃ এম.এস. কোরেশী
প্রযত্নেঃ কনসাল জেনারেল অব ফ্রান্স
পার্ক ম্যানশান্স
পার্ক ষ্ট্রীট
কলকাতা
ভারত

২, রু দেসতিয়েন দ'র্‌ভ্‌
৯১, ভেরিয়ের্‌ -লবুইস্নোঁ
ফোন : ৯২০৩৬-৭৯
২৬শে অক্‌টোবর, ১৯৭১

জনাব,

মসিয় অঁদ্রে মাল্‌রো আপনার পত্রের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তিনি একটি প্রস্তুতি মিশনে ভারতে আসবেন ভাবছেন এবং সেসময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করতে আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাই।

করিন গদ্‌ফের্‌নো

মাল্‌রো আর আসেননি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে খবর দেন যে, তিনি শীগগির প্যারিসে আসছেন। এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। ইন্দিরাজী প্যারিসে গিয়ে তাঁকে জানালেন, বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, তিনি যেন ধৈর্য ধরেন। কিন্তু মাল্‌রো কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েন। নানা ধরনের বিবৃতি দিতে থাকেন। শেষ অবধি কে-যেন গিয়েছিলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ততদিনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত যোগদান করে এবং শুরু হয় নতুন উপমহাদেশীয় সমর।

যুদ্ধান্তে দেশ শত্রুকবলমুক্ত হয় এবং যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে আমরা যে যার মত 'দেশ গড়ার কাজে' লেগে পড়ি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ফরাশি কনস্যুলেট একটি এমব্যাসিতে পরিণত হয় এবং প্রথম রাষ্ট্রদূত রূপে আসেন মসিয় পিয়ের মিলে। তাঁর চট্টগ্রাম সফরের সময় মাল্‌রোকে একবার বাংলাদেশে আনানোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করি আমরা। তিনি ছিলেন খুব মাল্‌রো-ভক্ত। মাল্‌রোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, বাংলাদেশে আগমনের প্রাক্কালেও তিনি দেখা করে এসেছেন। ১৯৭৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর একটি চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন (৪-৪-১৯৭৩) করতে এসে তিনি আমাদের জানালেন যে, মাল্‌রো শীগগির আসবেন। বর্তমান প্রতিবেদকের কাছ থেকে জেনে ইত্তেফাকের চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি মইনুল আলম তখন চট্টগ্রামের "পিপলস ভিউ' পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশ করেন (১৩।৪।৭৩) এটি সম্ভবত বাংলাদেশে মাল্‌রোর সফর সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশিত খবর। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের জন্য সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচীও আমরা তৈরী করে ফেলেছি। এই সময়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের উৎসাহে শিল্পপতি এ.কে খানের অর্থানুকূল্যে আমরা 'চট্টগ্রাম কলাভবন, প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে পড়ি। হাতে সময় কম, তবু আমরা একমত হলাম যে অঁদ্রে মাল্‌রোর মতো খ্যাতিমান শিল্পতত্ত্ববিদ, বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক ও মুক্তি-যোদ্ধা যদি এটি উদ্বোধন করেন, তাহলে আমাদের এই নগণ্য মফঃস্বলী প্রতিষ্ঠানটিও হয়তো কিছুটা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে। তাই, শিল্পাচার্য জয়নুল শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও বর্তমান প্রতিবেদককে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কাছে (৮-৪-৭৩)। পরম সমাদরে তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থিত একটি পোড়ো বাড়ী দেবার জন্যে

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিলেন। বাড়ীটি মেরামত করে একটি উপযুক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্বোধনীর জন্যে আমরা তৈরী হতে থাকলাম।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রোটোকল-প্রধান জনাব আরশাদ-উজ জামানের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবুল ফজল একটি তারবার্তা পেলেন এই মর্মে যে, প্রধান মন্ত্রীর অতিথি হিসেবে মসিয় মাল্‌রো ঢাকা আসছেন ২০ই এপ্রিল (১৯৭৩)। সেদিন থেকে চারদিনের জন্য ভাষাবিভাগ-প্রধান জনাব মাহমুদ শাহ কোরেশীকে দোভাষীরূপে পেলে তাঁরা বাধিত হবেন। কিন্তু দূতাবাস থেকে দূরালাপনীর ডাক পেয়ে দোভাষী ইতোমধ্যেই ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন, কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমতি লাভ করে।

এদিকে চট্টগ্রামে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানসূচী অনুমোদন ও কার্যকর করবার জন্যে আমরা একটি সংবর্ধনা সমিতিও গঠন করলাম। সর্বজনাব অধ্যাপক আবুল ফজল সভাপতি, বর্তমান লেখক সম্পাদক, জুনেদ চৌধুরী যুগ্ম-সম্পাদক এবং ডাঃ এ.এফ. এম. ইউসুফ কোষাধ্যক্ষ। এছাড়া, কলাভবনের জন্যে থাকলেন সর্বজনাব এ.কে. খান সভাপতি, বর্তমান লেখক সম্পাদক, সৈয়দ মুহম্মদ শফি কোষাধ্যক্ষ, রশীদ চৌধুরী কিউরেটার এবং চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক কো-অডিনেটার। দু'টি উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন চট্টগ্রামের কিংবা চট্টগ্রামে অবস্থানরত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

২০শে এপ্রিল মাল্‌রো আসবেন বাংলাদেশে, তাই সেদিনের কয়েকটি কাগজে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। 'দৈনিক বাংলা' ছাপলো দু'টি লেখা বর্তমান লেখকের "অঁদ্রে মাল্‌রো ও বাংলাদেশ" এবং মাহফুজ উল্লাহর "সংগ্রামী মানুষের সহযোগী সৈনিক অঁদ্রে মাল্‌রো" বিমান-বিলাটের কারণে মাল্‌রো সেদিন এলেন না। এলেন পরদিন সকালে (৮ই বৈশাখ, ১৩৮০)। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন, বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বেগম সুফিয়া কামাল এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। শাহীন স্কুলের ছেলেরা তাঁকে 'ভিভ্ মাল্‌রো' বলে 'জিন্দাবাদ' দিলো। অঁদ্রে মাল্‌রো একটি শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই একটি শিশুকে আদর জানিয়ে আমি বাংলাদেশের সব মানুষকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।' (প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনার জন্য পঠিতব্য : ১৯৮৩ সালের বিজয়দিবস সংখ্যা 'সচিত্র বাংলাদেশে' প্রকাশিত "অন্তরঙ্গ আলোকে অঁদ্রে মাল্‌রো" এবং ১৯৭৯ সালে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির 'চটল শিখা'য় প্রকাশিত "চট্টগ্রামে অঁদ্রে মাল্‌রো" নিবন্ধ)।

এরপর প্রোটোকল-প্রধানের সঙ্গে মাল্‌রো গেলেন বঙ্গভবন ও গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাতে। আমরা জড়ো হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে। সেখানে ডীন ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন উপাচার্য ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী। মাল্‌রো এসে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। চা-পান পর্বে দু'এক টুকরো পনীর খেলেন ঢাকার। ফ্রান্সে তৈরী ২৩৬ রকম 'ফ্রোমাজে'র কথা বললেন এবং এটি যে কিছু ব্যতিক্রমী ও উপাদেয় তা' স্বীকার করলেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠান। তাঁকে একটি রূপোর নৌকা উপহার দেওয়া হলো। মাল্‌রো তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা যে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে তার প্রশংসা করলেন। প্যারিস এবং অন্যত্র তাঁদের যে প্রতিপক্ষ রয়েছে তাঁরা তাঁদের এই ভূমিকার কথা জানে। সবাই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকে যে একটি আদর্শের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিমাণ রক্ত দিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই। বস্তুত, বাংলাদেশের ছাত্ররা পৃথিবীর বুকে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে সেজন্যে তাঁদের গর্ব হওয়া স্বাভাবিক। উত্তরাধিকারীদের কাছে তাঁরা বলতে পারবেন যে দাসত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে তাঁরা বদ্ধ পরিবেশে খালি হাতে যুদ্ধ করেছিলেন। মানুষের স্মৃতি এই গৌরবগাথা বহন করবে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। বিকেলে মাল্‌রো যান শহীদ মিনার এবং স্বাধীনতার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে, এরপর পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতে গেলে তিনি বললেন, এ ফুলের মালা তোমাদের গলায়ই সাজে। কারণ তোমাদের আত্মদানে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।

সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ আলিয়ঁস্ ফ্রঁসেজ্ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এই মহান ফরাশি সাহিত্যিককে। উক্ত অনুষ্ঠানে আলিয়ঁসের সভাপতি জনাব আরশাদ-উজ-জামানকে লক্ষ্য করে ফরাশি রাষ্ট্রদূত মসিয় পিয়ের মিলে বলেন :

'মহামান্য মন্ত্রী অঁদ্রে মাল্‌রো-কে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই ভবনে, আজ আমাকে প্রথম কিছু বলতে সুযোগ দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আপনি জানেন, ঢাকায় ফরাশি দূতাবাসটি এখনো অনেকটা বাংলাদেশের মতো। আমরা দু'জনা একসাথে জন্মগ্রহণ করেছি আর আমরা এখনও নিজেদের গঠন করতে ব্যস্ত রয়েছি। সেজন্যই এই মুহূর্তে এটিই সেই অনন্য ফরাশি ভবন যেখানে আমি মন্ত্রী অঁদ্রে মাল্‌রো-কে অভ্যর্থনা জানাতে পারি (বলা-বাহুল্য) এই সেই আলিয়ঁস্ ফ্রসেজ যার নিয়তি আপনি যোগ্যতা ও মমতাভরে পরিচালনা করে থাকেন।' তারপর মাল্‌রোকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

'মহামান্য মন্ত্রী,

এই ফরাশি সংস্কৃতিভবনে, আমি আশা করি, আপনি আমাকে তথা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে অনুমতি দেবেন যাতে আমি জেনারেল দ্যাগোলের প্রখ্যাত সংস্কৃতি মন্ত্রীর সামনে প্রটোকল' অনেকটুকু ভুলে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে অঁদ্রে মাল্‌রো বলে অভিহিত করতে পারি সংক্ষিপ্তভাবে, যে সংক্ষিপ্ততা অবশ্য অনেক দীর্ঘসূত্রিতারই নামান্তর।

বস্তুত, 'মহামান্য মন্ত্রী' বহু, হয়তো-বা একটু অতিরিক্ত রকমে বেশী, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, আপনার মত কেউ নন। তাই এই নাম গোপনকারী অর্থহীন সম্মানসূচক সম্বোধনে আপনাকে আজ ঢাকায় আমাদের মধ্যে পেয়ে যে ভাবাবেগ ও কৃতজ্ঞতাবোধ আমরা অন্তরে উপলব্ধি করছি, তার যথার্থ প্রকাশ সম্ভব হবে না।

বাস্তবিকই এমন একজনকে এখানে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ মিলছে আমাদের, যাঁর সৃষ্টি ও কর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে একসূত্রে গাঁথা। এবং যিনি তাঁর জীবনে অনেকবার তরবারীর জন্য কলম ছুঁড়ে ফেলেছেন (সত্যিকার তরবারী, ফরাশি একাডেমীর সদস্যদের ভূষণ তরবারী নয়। অবশ্য আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের মতো জায়গায় যদি আমাকে এ মন্তব্য করবার অনুমতি দেওয়া হয়। (জানি) সম্মানকে আপনি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেন না। অনেকটা যেন অস্ত্রদানের অনুষ্ঠান, আপনার মতো এতো উত্তম উপায়ে পরলোকগত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করতে কে-আর পেরেছে? জঁ মুলাঁ, ব্রাক্, ল্য কর্‌বুজিয়ে প্রমুখের প্রতি (শুধু এ ক'টি নামই উল্লেখ করলাম) ফ্রান্সের নামে আপনি যে (ভাষায়) শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন, তার কথাই আমার মনে পড়ছে।

কিন্তু আপনার জন্য এবং আপনার জীবনাচরণে তা' প্রমাণিত, মান-সম্মানের প্রশ্ন সম্মান-পুরস্কারের অনেক উর্ধ্বে। যথার্থভাবে আপনি মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত—ফ্রান্স এবং তার বিশ্বজাগতিক ক্রিয়া-কর্মে নিবেদিতচিত্ত।

অঁদ্রে মাল্‌রো, আপনি বলেছেন, বারংবার বলেছেন যে ফ্রান্স সত্যিকারভাবে তার আত্মাকে খুঁজে পায় যদি সে আত্মস্বার্থবিহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ক্রুসেড এবং মহান ফরাশি বিপ্লবেরও কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আপনার বিনয়বোধকে আহত করবার সম্ভাবনা থাকলেও বলতে চাই, এই বিশ্বাসের কোনো মূল্যই নেই যদি তা' (সংশ্লিষ্ট সমাজ মানসে) গভীর ভাবে নাড়া দিতে না পারে। ১৯৭১ সালে পৃথিবীর সব সরকার যখন পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের নিধন-পর্ব উপেক্ষা করতে চাইছিল, তখন আপনার একক কণ্ঠ সেদিন গোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের সমর্থনে কথা দিয়ে নয়, কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য। তাই সৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার মতে, কথার সময় নয় তখন। আরো একবারের জন্য আপনি নিপীড়িতদের জন্য অর্থাৎ বাঙালিদের জন্য অস্ত্রধারণে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতীতে স্পেন এবং ফ্রান্সে ফরাশি প্রতিরোধ সংগ্রামে কর্নেল বের্‌জে-রূপে আপনি যা' করেছিলেন। আপনার এই ডাক আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—আপনার বিনয় বোধের ওপর আবার কিছুটা অত্যাচার করেই বলছি— তাঁর কথা, যিনি ১৯৪০ সালে এ-রকম এক ডাক দিয়ে ফ্রান্সের সম্মান রক্ষা করেছিলেন আর আপনি যাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী। নির্যাতিত জনগণের মুক্তির মহাকণ্ঠ আপনি। তাই আজ আপনাকে দেখি মাও-জে-দঙ, নিক্সন এবং শেখ মুজিবর রহমানের বন্ধুরূপে, কখনো তাঁদের উপদেষ্টার ভূমিকায়।

শুধু রাজনীতির কথা যদি বলি, যে—নেতারা মানুষের আশা ও দুর্দশার কথা বেমালুম ভুলে কেবল বক্তৃতার আশ্রয়ে বেঁচে থাকেন, তাদের লম্বা বক্তৃতার চাইতেও আপনার কণ্ঠ অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে সারা দুনিয়ায়। সে দিন আরেকবারের জন্য আপনি তাদের 'আশা' দিয়েছিলেন—যারা 'মানব পরিস্থিতি'র নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয়েছিল। এবং বাঙালিরা আপনার মধ্যেই

ফ্রান্সের আত্মাকে চিনতে শিখল অথবা আপনার মাধ্যমেই তা' পুনর্বার খুঁজে পেল। আমার স্বদেশবাসীর নামে অভিনন্দিত করি আপনাকে এবং আরো করি সেই পুরনো সম্পর্কের সূত্রধরে, আপনি যা' করেছেন, যা' বলেছেন, যা' লিখেছেন, যে অত্যাচার সহ্য করেছেন তার জন্য মমতা ও প্রশংসার সাক্ষীরূপে।

অঁদ্রে মাল্‌রো, বাংলাদেশে ফ্রান্সের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার যোগদানের প্রাক্কালে আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন "দেখুন মিলে, আমরা সবসময় সেইসব অস্তিত্বহীন দেশের অস্তিত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেছিলাম, তাই না ?"

আপনার নিশ্চয়ই সেই ফরাশি প্রবাদের কথা মনে আছে, ভিলোঁ যা' তাঁর একটি গাথা কাব্যে ধ্রুবা স্বরূপ ব্যবহার করেছেন : "ডাকে বারবার, আসে বড়দিন" আপনি ডাক দিয়েছিলেন, "বাংলাদেশ"। বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করল, আপনার স্বপ্ন সন্তান। আপনার বাঙালি ও ফরাশি বন্ধুরা ডাক দিয়েছেন, "মাল্‌রো"। এইতো আপনি এখানে, আমাদের মাঝখানে, এই সন্ধ্যায়।

আরেকবার, শেষবার নয় কিন্তু : ধন্যবাদ, অঁদ্রে মাল্‌রো।'

মসিয় অঁদ্রে মাল্‌রোর জবাব :

(রাষ্ট্রদূতের প্রতি) 'বন্ধুত্বপূর্ণ উক্তির জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ,

আমি এসেছি, একরকমভাবে বলতে গেলে, ফ্রান্সের কথা বলতে, অবশ্য এই আশ্চর্য ভাঙা কণ্ঠে, যার জন্য সেই হাওয়াই জাহাজটির কাছে আমি ঋণী যেটি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনাদের আমি একটি খুব সহজ অভিজ্ঞতার গল্প বলব। আমি যা বানিয়ে বলতে পারতাম তার চাইতেও এটি বেশী মূল্যবান।

এখানে আসবার আগে আমি আমাদের পুষ্পমুকুট বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম স্বাধীনতার সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভে। পরে আমি যাই পঙ্গু হাসপাতালে। আপনাদের (নিশ্চয়ই) বলবার প্রয়োজন করে না যে, মৃত্যুতেই শুধু বৃহৎ ট্র্যাজিক ছায়ার আবির্ভাব হয় না। সেটি আসে ক্ষতচিহ্নের মাধ্যমে। ভিক্তর্ উগোর মত হয়তো বা সে খুব অল্প দেখা —যুদ্ধাবসানের এই মৃতদের,

যাদের ওপর রাত্রি নেমে এসেছে তাদের দেখা, (অথবা) হাসপাতালের অতি সাধারণ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধ যুবকটি যে আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ ঠিক আপনার বরাবরে তার পঙ্গু হাত দুটি বাড়িয়ে দিলে, তাকে দেখা। এ-রকম ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়ে থাকে, ঠিক তেম্‌নি, এই হতভাগ্যদের একজনকে শুধালাম : কোথায় সে আহত হয়েছে ? ভালো হবার সম্ভাবনা কেমন ? ইত্যাদি। এবং তখনই এগুলোকে বেশ অসার মনে হচ্ছিল অমনি, যে আমাকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল তাকে বললাম, "এই ফুল আমাকে নয়, তোমাকেই দেয়া উচিত।" তার গলায় আমি মালাটি পরিয়ে দিলাম। তারপর আমি যখন অন্য পঙ্গু আহতদের করমর্দন করে এগিয়ে চলেছি তখন, ১৫০ মিটার দূরে, হাঁটতে অপারগ হতভাগ্য ছেলেটি আরেকটি মালা নিয়ে হাজির—সমস্ত আহতদের পক্ষ থেকে মালাটি সে আমায় দিতে চাইল।

তা'হলে, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, তা'হলে ফ্রান্সের তাৎপর্য এখানে যে, সে একজনকে এখানে পাঠিয়েছে এইসব (আহতদের) হাতে হাত মেলানোর জন্য আর তার বিনিময়ে, এই হাতগুলো নিয়ে এসেছে ফুল আর ফুল।

এখন আমরা সবাই—যা উচিত, যা' পারি তা' যেন করি এবং তাই আমরা করব। আপনারা এখানে প্রত্যক্ষ করছেন কিছু মূল্যবোধ যা' অতীতে ছিলো মহামূল্যবান এবং বস্তুত যা' আমরা বিশ্বে পরিবেশন করে দিয়েছি। মাননীয় রাষ্ট্রদূত যথার্থই বলেছেন, ক্রুসেডেরই হোক আর রিপাব্লিকেরই হোক, ফ্রান্স ফ্রান্সই নয় যদি-না সে অন্য সবার জন্য না-হয়।

এটা সত্য যে প্রাচ্যের প্রতিটি গড়কে রয়েছে অশ্বারোহী ফরাশি বীরের কবর। এটা সত্য যে, ইউরোপের প্রতিটি সমাধি ক্ষেত্রে রয়েছে দ্বিতীয় শতকের সৈনিকের স্মৃতি। আমি বলি, এর পরিবর্তে আমরা যে যা'-পারি তা' যেন করি। আপনারা সবাই উপলব্ধি করেন, ফ্রান্স তার চিন্তা, তার ন্যায় বিচার এবং তার সৎসাহস দিয়ে জগতকে কী শ্রেয়ের সন্ধান দিয়েছে। সব মানুষের জন্য সে যা' ছিল তার নামে, জেরুজালেমের মৃতদের কাছে সে যা' ছিল তার নামে, প্রজাতন্ত্র আবিষ্কারের কালে সে যা ছিল তার নামে, কিংবা শুধুমাত্র ফ্রান্সের নামে,—ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, আমি, আপনারা এখানে যা করছেন তার জন্য, শুধুমাত্র আপনাদের উপস্থিতির জন্য, ধন্যবাদ জানাই।'

বক্তৃতার পর মাল্‌রোর সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি, বিশেষ করে ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক অত্যন্ত খোলামেলা পরিবেশে ভাব বিনিময় করেন।

সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় ভোজসভা। সেখানে মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছাড়াও ছিলেন কয়েকজন বুদ্ধিজীবী। ভোজের পর একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো অঁদ্রে মাল্‌রোর সম্মানে।

২২শে এপ্রিল, ১৯৭৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গৌরবময় দিন। কেননা এই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দেওয়া হবে এবং যাঁকে দেওয়া হবে তিনি স্বয়ং অঁদ্রে মাল্‌রো—এক বিশ্ববরেণ্য মনীষী এবং বাঙালিদের প্রিয় বিদেশী-ব্যক্তিত্ব। সকাল সাড়ে আটটায় কাজলার খেলার মাঠে নাবলো দু'টো হেলিকপ্টার। একটি থেকে অবতরণ করলেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আবু সাইদ চৌধুরী এবং তাঁর ষ্টাফ। অন্যটি থেকে নাবলেন দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, ফরাশি কূটনীতিক এবং দোভাষী। অভ্যর্থনা জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ডীন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও অধ্যাপকবৃন্দ। উপাচার্য ডঃ সারওয়ার মুরশিদ গেছেন পুরনো বিমান বন্দরে এক বিশেষ বিমানের যাত্রী অঁদ্রে মাল্‌রোকে আনতে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশেষ সমাবর্তন উৎসব শুরু হলো কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে। সবার গায়ে সমাবর্তনের বিশেষ পোশাক। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য মসিয় অঁদ্রে মাল্‌রোকে প্রথামাফিক ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত করলেন চ্যান্সেলারের কাছে। ইংরেজিতে লিখিত তাঁর বক্তব্যে শিল্প-সাহিত্য এবং মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে মাল্‌রোর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে সবিনয় অনুরোধ জানালেন। চ্যান্সেলার চৌধুরী বাংলায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন মাল্‌রোকে 'ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামকালের অনেক বীরত্ব, অনেক দুঃখ-শোকের স্মৃতিবিজড়িত স্থান এই রাজশাহী'তে···'আপনাকে আজ এ সম্মানে ভূষিত করে আমরা প্রকৃত-পক্ষে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের নিয়তিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতায় মানুষের আত্মবিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

প্রত্যুত্তরে মাল্‌রো এক দীপ্ত ভাষণ দেন ফরাশি ভাষায়। ভাষণটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্মারণিকায় বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত

হয়েছে। পরে চট্টগ্রামেও তিনি একই ভাষণ দেন, দু'চারটি পংক্তি যোগ করে। সেটি যথাস্থানে মুদ্রিত হবে। আপাতত সমাবর্তন উৎসবের পর উপাচার্য-ভবনে একটি চা-চক্রে নিয়ে যাওয়া হলো অতিথিদের। পরে ঘণ্টাখানেক বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিয়ম দেখে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। বরেন্দ্র যাদুঘর তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। তাঁর সঙ্গিনী সফি দ্য ভিলমোর্যাঁর জন্য অনেক ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন যা' ফরাশি দূরদর্শন চিত্রায়িত করছিলো।

ঢাকায় মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ছিলো প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে। বিকেল সাড়ে চারটায় মাল্‌রো এলেন ঢাকা যাদুঘরে। দেড়ঘণ্টা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তিনি দেখলেন, আমাদের অতীত ঐতিহ্যের স্মারক নানা শিল্পকর্ম। সন্ধ্যা ছ'টায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় চারু ও কারুকলা কলেজে। সাম্প্রতিক শিল্পকর্ম দর্শন ছাড়াও ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর কাটে আনন্দঘন মুহূর্ত। সে রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আয়োজিত নৈশভোজন এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত হন অতিথিবর্গ।

পরদিন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম অভ্যর্থনা জানালো অঁদ্রে মাল্‌রোকে। বিমান বন্দরে অধ্যাপক আবুল ফজল এবং আরো অনেকে ছিলেন। উষ্ণ অভ্যর্থনায় মাল্‌রো অভিভূত। প্রথমে যান বন্দরের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে, তারপর সম্বর্ধনা সভায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজিয়া শহীদ ও সহশিল্পীরা 'ধন্যধান্যে পুষ্পেভরা' গানটি গেয়ে শোনান। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক আবুল ফজল। বাঁশের ফ্রেমে তৈরী করা এক আধারে বাংলা ও ফরাশিতে সমার্থক মানপত্র প্রদান করলেন বেগম কামরুন্নাহার জাফর। এটি পাঠ করলেন জনাব এ. কে. খান। মাল্‌রোর রচনা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে লেখা মানপত্রটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

'মানুষের পরিচয় তার কর্মে' তোমার জীবনাচরণ তোমার এই উচ্চারণকে দিয়েছে যথার্থ। তাই তোমার পরিচয় আমরা পাই তোমার কর্মে, সংগ্রামে এবং শিল্প সাধনায়। ফরাশি দেশে তথা সমগ্র বিশ্বে শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে তুমি বিশিষ্ট, তুমি অনন্য।

বাংলাদেশ—জন্মের আগে ও পরে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলো। তুমি এসেছ। আমরা ধন্য। বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক অর্গল আজ উন্মুক্ত। তুমি

এসেছ আজ বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে, যেখানে যুগ যুগ ধরে মানবমাহাত্ম্য ও বিপ্লবের জয়গানে মানুষ মুখর। সে ঐতিহ্যের সাথে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে তোমার কর্ম ও উচ্চারণ আমাদের সংগ্রামী ও সৌন্দর্যাভিসারী করবে। 'অন্য কোনখানে ওপরে, আলোয়' নিয়ে যাবে। এ প্রত্যয় আমরা তোমার শুভ কামনা করি।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৩ তোমার গুণমুগ্ধ চট্টগ্রামবাসী'

মাল্‌রোকে উপহার দেওয়া হলো দুশো বছরের পুরনো একটি বাংলা পুথির পাণ্ডুলিপি। সংবর্ধনার জবাবে মালরো বলেন :

"যেহেতু এখানেই বাংলার প্রথম সেনাবাহিনী ১৯৭১ এর মার্চ-এপ্রিল জনগণের মুক্তি-সংগ্রামীদের সাথে যোগ দিয়েছিল, সেহেতু সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে আমি আপনাদেরকে কিছু বলবো :

অতীতে পারস্যের বিপুল সেনাবাহিনী যখন গ্রীসে অভিযান চালাতে আসে, থেরমোপিলোসে ৩০০ লোক তাদের বাধা দিতে গিয়ে এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। ওরা যেখান মৃত্যুবরণ করে সেখানে খোদিত হয়েছে গ্রীসের সবচেয়ে বিখ্যাত, হয়তো বা সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপি :

"যে-তুমি এপথ দিয়ে যাবে পরবর্তীকালে আমাদের দেশের লোকদের বলো যে, যারা এখানে পড়ে আছে, তাদের মৃত্যু ঘটেছে দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে।"

আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে-কোন কবরস্থানের উপর, আপনাদের বুদ্ধিজীবীদের গলিত শবে ভর্তি যে কোন খানা ডোবার ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখুন :

"যে-তুমি এ পথ দিয়ে যাবে পরবর্তীকালে আমাদের স্বজনদের গিয়ে বলো যে, ওখানে ওরা মৃত্যুর শিকার হয়ে পড়ে আছে, কেননা নয় মাসের সে দুর্দশার দিনে ওরা কবুল করেছিল খালি হাতে লড়বে বলে'।"

'ইউনিফর্ম-বিহীন ফৌজের সে-এক দীর্ঘ এবং মহৎ ঐতিহ্য।

ইউরোপের সমস্ত রাজরাজড়ার বিরুদ্ধে ফরাশি বিপ্লবের ফৌজ, রাশিয়ার 'রেড আর্মি', 'লং মার্চে' অংশগ্রহণকারী মাও-জে-দঙের সৈন্যদের সে একই ঐতিহ্য।

চীন যদি পাকিস্তানকে সত্যিকার ভাবে সাহায্য করে থাকে তাহলে তা' করেছে তার নিজস্ব সেনাদের মত যাদের দেখায়, লেনিনের আমল থেকে যাদের 'পার্টিজান' বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে।

সালাম, আমাদের চার পাশের বনানীর অভ্যন্তরে শায়িত মৃতরা, সালাম।

অনেক হত্যাকাণ্ডের পরও বিশ্বকে আপনারা দেখিয়েছেন, আত্মসমর্পণ বিরোধী একটা জাতির আত্মাকে খুন করা যায় না। আপনাদের মধ্য থেকেই তো জনতা একদা শেখ মুজিবর রহমানকে কারার প্রাচীর ভেঙ্গে আনতে গিয়েছিলো। তখন মনে হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশও যেন কারাভ্যন্তরে ছিলো! আর আপনারাইতো অগুন্তি দেহের ছায়ায় সংযুক্ত বাহিনীর ট্যাংককে ঢাকার পথ দেখিয়ে এনেছিলেন।

আমরা আপনাদের সমর্থন করেছি কেননা আপনারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত, সবচেয়ে ভয়ার্ত পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ। তাছাড়া, আপনারা অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সভ্যতার, যে সভ্যতা তিন হাজার বছর ধরে মানবতার সভ্যতা।

সম্রাট অশোক হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বললেন :

"মানুষ এবং জীবজন্তুকে ছায়া আর আশ্রয় দেবার জন্য সমস্ত সড়ক পথে আমি বৃক্ষ রোপণ করে দেব।"

গান্ধী হচ্ছেন আমাদের কালের একমাত্র ত্রাতা। যিনি মানবাত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

বিশ্বকে আপন ইচ্ছামত ব্যবহার করবার প্রয়োজন রয়েছে মানুষের। আজ আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়ায় অনেক হতাশাগ্রস্থ যুবশক্তি। চাঁদে যাওয়ার প্রয়োজন কী? যদি সেখানে যাওয়া শুধু আত্মহত্যার জন্যে?

শাশ্বত বাংলা এবং ফরাশি বিপ্লবের ভাষাকে সংযুক্ত করবার প্রয়াস ছিলো আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে।

বহির্বিশ্বে এখনো এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এমন এক অনন্য দৃষ্টান্ত যা' একনায়কত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষ্টালিন নয়, হিটলার নয়, মাও-জে-দঙ নয় : গান্ধী আর শেখ মুজিবর রহমান।

বিশ্ব যদি বুঝতে না পারে, তার চোখ খুলে দেবার সময় হয়েছে। এবং আমরা তা' করবোই।

আপনাদের কাছে, ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবীর কাছে, আমার এক বিশেষ আবেদন আছে আমি যখন শহীদ ছাত্রদের স্মৃতি-স্তম্ভে পুষ্প-মুকুট পরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম তখন এই চিন্তা আমার মাথায় এলো যে, পৃথিবীর কোন দেশে এতবেশী সংখ্যক ছাত্রের উপর এতবেশী অত্যাচার কখনও ঘটেনি। আপনারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতা এখন আপনাদের হাতের মুঠোয়, কিন্তু এক নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে এখন, শাদা সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর সোভিয়েট ইউনিয়নে যেমন শুরু হয়েছিল।

যুদ্ধ বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ বাংলাদেশ শান্তি চায়। আপনাদেরকে কাজ করে যেতে হবে দ্বিতীয় বিজয়ের জন্য। সত্যিকার রাষ্ট্র গঠনের জন্য। এটা খুব সহজ নয়। কিন্তু আপনাদের পঙ্গু, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি দেখেছি। আমি জানি, তারা যা' করেছে তাও খুব সহজ ছিল না।

পরে যখন বলা হবে : ওরা শূন্য হাতে যুদ্ধ করেছিলো—তখন যেন একথাও যোগ করা যায় : স্বাধীন বাংলাদেশ পাঁচ বছরে যা' করেছে পরাধীন বাংলাদেশ পঁচিশ বছরেও তা' করতে পারেনি।

স্বাধীনতার যুদ্ধ এখানে শুরু হয়েছিলো। শান্তির সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানেই শুরু হোক।

আজ এ শহরের নেতৃবৃন্দর সঙ্গে আমি মিলিত হচ্ছি আপনাদের প্রয়োজনের তালিকা প্রস্তুত করতে। আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তালিকার অগ্রগণ্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা হবে। এবারের সংগ্রাম আমরা একসঙ্গেই চালাবো।

জয়, চট্টগ্রামের জয়।
জয়, বাংলাদেশের জয় ॥'

দুপুরে শিল্পপতি এ.কে. খানের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। সে এক আন্তর্জাতিক উৎসব। অত্যন্ত উৎফুল্ল-চিত্তে মাল্‌রো খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব করলেন, অনেকের অটোগ্রাফের আবদার রাখলেন। আবার পঞ্চাশ মিনিট ধরে একান্তে জনাব খানের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যাবলী ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় মত্ত হলেন। বিকেলে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান ছিলো আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। সেখানে রূপোর থালায় বরফ কুচির ওপর রাখা ডাবের পানি খেয়ে খুব তৃপ্ত হলেন অঁদ্রে মাল্‌রো।

আলিয়ঁসের পক্ষ থেকে প্রতিবেদকের ফরাশি বই : 'বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭' তাঁকে উপহার দেওয়া হলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের একটি প্রদর্শনী হচ্ছিলো সেখানে। সেটি দেখলেন। এরপর এলেন 'চট্টগ্রাম কলাভবন' উদ্বোধন করতে। ভাষণে তিনি 'ক্যানভাসে দেশজ সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে' আহ্বান জানালেন। কারণ বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরণের পরিবর্তে নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরার মধ্যেই নিহিত শিল্পীর সাফল্য'। তাঁকে আমরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের একটি ছবি উপহার দেই, এবং বাংলাদেশের সেরা শিল্পীদের বাছাই করা শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। শিল্পী সবিহ্-উল আলমের শিশুপত্র নায়কের কাছ থেকে একটি ছবি উপহার পেয়ে মাল্‌রো ভারি খুশি হলেন এবং তাকে কোলে তুলে চুমু খেলেন।

অনুষ্ঠান শেষে হেলিকপ্টারে চড়িয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো কাপ্তাইয়ে। সেখানে এ.কে খানের হাউজবোটটি অপেক্ষা করছিলো অতিথিদের জন্যে। টাই-কোট খুলে সবাই আরাম-কেদারায় বসে কাপ্তাই হ্রদের সান্ধ্য-সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে প্রস্তুত হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ নিসর্গ মুগ্ধ করলো মাল্‌রোকে। অন্ধকারে হঠাৎ দেখা গেলো কয়েকটি যাত্রীবাহী স্টীমার। আর সেখানে ভেসে আসছে পূর্ণকণ্ঠ শ্লোগান : 'ভিভ্ মাল্‌রো'। আবার জয়-ধ্বনি !

পরদিন ঢাকায় ফিরে মাল্‌রো একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক, ইউরোপীয়রা যা' অনুমান করে তার চাইতেও বেশী। তাই মুক্তিযুদ্ধেরও অধিক এক সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের সামনে। সবার উচিত আরো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের প্রশ্নে বিতর্ক অনুচিত। কেননা 'মুক্তিযোদ্ধা ব্যতিরেকে স্বাধীন বাংলাদেশ কল্পনা করা যায় না। ওরা ট্যাংকের চেয়েও শক্তিশালী।'

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১২-২৫ মিনিটে অঁদ্রে মাল্‌রো তাঁর সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা সফর শেষ করে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানে ওঠার আগে এবং প্যারিসে পৌঁছার পর পর্যায়ক্রমে কয়েকদফায় তিনি তাঁর নগণ্য দোভাষীর জন্যে উপহার-স্বরূপ পাঁচটি মূল্যবান বই পাঠিয়েছিলেন।

এর মধ্যে তিনটিই ছিলো স্বাক্ষরিত। বাকী দুটি সরাসরি এসেছে প্রকাশকের বাড়ী থেকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে লেখেন এক পত্র, কিংবা প্রশংসা-পত্র। এটি এখানে প্রকাশিত হচ্ছে প্রধানতঃ বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তার একমাত্র জ্ঞাত প্রমাণস্বরূপ :

'ডঃ এম. এস. কোরেশী
ভাষা বিভাগ প্রধান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

২, রু্য দেস্‌তিয়েন দ'র্‌ভূ
৯১৩৭০ ভেরিয়ের্‌ ল্য বুইসোঁ
ফোন : ৯২০-২০-০
৮ই মে, ১৯৭৩

প্রিয় প্রফেসর,

প্যারিসে ফিরে (সঙ্গে অসামান্য সৌজন্যের স্বাক্ষর বহনকারী আপনার বইটি। আপনাকে বলতে বাধ্য বোধ করছি যে আমাদের সহযোগিতার বন্ধুত্বপূর্ণ স্মৃতি আমি লালন করে চলেছি। আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আপনার সহায়তা ব্যতিরেকে চট্টগ্রামের শ্রোতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা' হয়েছে তা' কখনো হতে পারতো না। আপনার অনুবাদ তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং যথার্থতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, কখনো বা পেরেছে মর্মমূলে পৌছে যেতে। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করা যাক : এখন যেন ভালভাবে শেষ করতে পারি সেসব কাজ যা' আমরা শুরু করেছি আপনাদের দেশের জন্যে যে-দেশ কিছুটা আমারও হয়ে পড়েছে। প্রিয় প্রফেসর, আমার অনাবিল স্মৃতিস্নিগ্ধ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

অঁদ্রে মাল্‌রো'

পত্র প্রাপ্তির মাস চারেক-এর মধ্যে প্যারিসে মাল্‌রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় প্রতিবেদকের। অত্যন্ত আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়ন ছাড়াও মাল্‌রো বাংলাদেশ সম্পর্কে যে তখন কতোখানি আগ্রহী ছিলেন সেটা দেখার, শোনার ও অনুভবের বিষয় বটে। প্রথমত নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করলেন। তবু মেটে না তাঁর কৌতূহল। তারপর জানালেন যে ফরাশি সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন সম্পর্কে যেন বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তখন প্যারিসে যিনি বাংলার ফরাশি প্রফেসর ছিলেন তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে বাংলা উঠিয়ে দেবার একটা ষড়যন্ত্র

চলছে, অঁদ্রে মাল্‌রোর মাধ্যমে এটা বন্ধ করার জন্যে যেন চাপ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমান প্রতিবেদক যেহেতু প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রথম প্রভাষক, তাই ফ্রান্সের প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী মাল্‌রোকে প্যারিসে গমনের পূর্বাহ্নে নির্দ্বিধায় অনুরোধ জানান এ বিষয়ে কিছু করার জন্যে। মাল্‌রোর সুপারিশ কাজে লাগেনি বলা যাবে না। কারণ বাংলা এখনো চালু আছে ওখানে। এরপর আমাদের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে অথবা আপন দায়িত্ব-বোধ থেকে যে-সব কাজ করে আসছেন তার ফিরিস্তি দিলেন। বিশেষ করে, ১. বাংলাদেশের জন্য সাহায্য এবং কেবল প্রয়োজনীয় সাহায্য বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো ; ২. চীন যেন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে বাধা না দেয় সে ব্যাপারে চেষ্টা করা। সাহায্যের ব্যাপারে ফরাশি সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং করবে— এটা জোর দিয়ে বললেন। দেশে ফিরে নেতাদের জানাতে বললেন যে, চীন এখন স্বীকৃতি দেবে না। তবে জাতিসংঘে প্রবেশের পথেও আর বাধা দেবে না।

দেশে ফিরে নেতাদের এসব কথা বলার অবকাশ বা সুযোগ কোনোটাই হয়নি। হয়তো বা প্রয়োজনও ছিল না।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর সম্মানিত অতিথিরূপে বাংলাদেশ সফরের কারণেই হোক, বা 'বীরই বীরের সম্মান দিতে পারে' এই প্রবাদের তাৎপর্য-রক্ষার্থেই হোক — বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে ছিলো তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা। তাঁর কিছু মন্তব্য রয়েছে যা' আর-কিছু না হোক, একেবারে মৌলিক। প্রথমত, বিখ্যাত চিত্রসমৃদ্ধ ফরাশি সাপ্তাহিক 'পারী-মাচ' এর সাংবাদিক জাক্‌ গারোকালোকে মাল্‌রো বলেছিলেন : 'আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান সালাদীনের মতো ইসলামের এক বীর।' নির্বাচন বিজয়ের কারণেও মাল্‌রো তাঁর নেতৃত্বে বিশেষভাবে আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়েছিলেন। (দ্র. পারী মার্চ, ১২৫৬ তম সংখ্যা, ২রা জুন, ১৯৭৩)। ফ্রেডেরিক গ্রোভের নামক একজন পাশ্চাত্য মাল্‌রো-বিশেষজ্ঞ ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রশ্নে ছ'টি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেগুলো সংকলন করে একটি ছোট বই প্রকাশ করেছেন প্যারিসের গালিমার। গ্রোভারের সর্বশেষ সাক্ষাৎকার ছিলো ১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৫। আলোচনা শেষ হবার পর মাল্‌রো জানালেন, তাঁর বাংলাদেশের 'বন্ধু' মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত। পূর্বাহ্নে তিনি যখন

গ্রোভারকে খ্রীষ্টিয় ধর্মানুভূতিসম্পন্ন ফরাশি-সাহিত্যিক বের্নানোসের কথা বলছিলেন তখন শেখের কথা তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল কারণ তিনি নাকি দেখতে অনেকটা বের্নানোসের মতোই।

স্মিতহাসি নিয়ে অনুরাগীর সামনে উপস্থিত ব্যক্তি-মাল্‌রোর সঙ্গে ছবির বা কর্মক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বটির মিল কতোখানি—তা বলা মুশকিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হলে মাল্‌রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ফ্রান্সের পরিত্রাতা জেনারেল দ্য গোলের ; সাক্ষাতের পর তিনি নাকি মন্তব্য করেন, 'অঁফ্যাঁ অঁ্যানম্!' অর্থাৎ অবশেষে একজন যথার্থ মানুষ দেখলাম! বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পটভূমিতে ঊর্ধ-সত্তরের মাল্‌রোকে মনে হয়েছে সর্বমুহূর্তে সজাগ, পৃথিবীর সবচে' বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের একজন।